ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি

ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি

শান্তিদেব ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই ফাল্গুন, ১৩৬২

এক টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

চিরস্মরণীয়েষু

এই প্রবন্ধকটির মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ টি বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবা বিভাগের অনুরোধে তার কর্মীদের উদ্দেশ্যে গঠিত বাৎসরিক শিক্ষা শিবিরের শিক্ষার্থীদের কাছে পঠিত। পঞ্চমটি লিখেছিলাম দিল্লীর বাৎসরিক লোকনৃত্য উৎসবের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে। প্রথম ও দ্বিতীয়টি 'দেশ' পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত।

শান্তিনিকেতন

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

শান্তিদেব ঘোষ

গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শিক্ষা ... ১
গুরুদেবের "শিক্ষাসত্র" ও মহাত্মাজীর 'নঈ-তালিমী' শিক্ষা ... ১১
গ্রামীণ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা ... ২৬
গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের উপায় ... ৩৩
গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকনৃত্য ... ৪৩

গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শিক্ষা

আমাদের দেশে প্রচলিত কথায় বলে, ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে 'মানুষ' হবে বলে। এখানে 'মানুষ' হওয়া বলতে এই অর্থ করা হয় যে, যে ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল পাশ করবে, ভাল মাইনের চাকরী পাবে ও টাকা যে জমাতে জানে। এপক্ষে যার চেষ্টা নেই, বা চাকরীজীবনে যে তেমন উন্নতি করতে পারল না, সাধারণত তাকেই আমরা বলি 'মানুষ' হল না।

এই কথাটার অর্থ যদিও আমরা আমাদের মত সহজ করে নিয়েছি, কিন্তু এর অর্থ আরো গভীর, আরো ব্যাপক। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একে বলা চলে মনুষ্যত্বের সমগ্র বিকাশ। অর্থাৎ জগৎকে জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে ও আনন্দরূপে একত্র পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে। অথবা জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে ও আনন্দরূপে প্রকাশিত যে বিরাট বিশ্ব, মানুষ যে তারই অংশ বিশেষ, তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এই অনুভূতির উন্মেষই মানুষের মনুষ্যত্ব।

নিজের জ্ঞানের নাগালে তিন রকমে আমরা জগৎকে পেতে পারি। এক হচ্ছে দার্শনিকের দৃষ্টিতে জগতের স্বরূপটিকে জানার দ্বারা পাওয়া; দ্বিতীয় হল বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে জাগতিক শক্তির স্বরূপকে প্রকাশ করে তাকে আয়ত্ত করার দ্বারা পাওয়া; তৃতীয় হল দৃষ্টি, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও অনুভূতির দ্বারা জাগতিক আনন্দের নানা প্রকাশকে হৃদয়ে গ্রহণ করার দ্বারা পাওয়া।

আনন্দের সম্বন্ধে জগৎকে পাওয়া বলতে আমরা বুঝি যে, এই বিশ্বপ্রকৃতি হচ্ছে একটি বিরাট আনন্দের প্রকাশ। আকাশ, বাতাস, আলো, গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখী, নদনদী, অরণ্য, পাহাড় ইত্যাদি

নানা রূপে, রঙে, বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে ও শব্দে সর্বদাই সেই আনন্দময় স্বরূপকেই প্রকাশ করে চলেছে। মানুষ হচ্ছে সেই প্রকাশেরই একটি অংশ বিশেষ। "মানুষ আপনার সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখতে পায়" বলেই শিল্পীর শিল্পে, কবির কাব্যে, সুরকারের গান বাজনায়, নর্তকের নাচে মানুষের সেই জন্যেই এত অনুরাগ।

এইভাবে জ্ঞানে, কর্মে ও আনন্দে মানুষ জগতে ব্যাপ্ত হবে, মনুষ্যত্বের এই লক্ষ্য। এইরূপ মনুষ্যত্বের বিকাশের দ্বারা চিত্তের যে ঐশ্বর্য প্রকাশ পায়, তাকেই গুরুদেব বলেছেন সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে আসে শান্তি, আসে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মসংযম আসে, এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে। মনুষ্যত্বের এই সত্যটিকে স্বীকার করে প্রাচীন ভারতের মানুষ তার সমাজকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। এর একটিকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যতক্ষণ মানুষ বলে নিজেকে পরিচয় দেবার স্পর্ধা রাখি।

মনুষ্যত্বের এই সত্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রথম স্বীকার করেছিলেন আমাদের দেশের তপোবনবাসী মুনি বা ঋষিরা। প্রাচীন তপোবনের শিক্ষার মূলে ছিলো এই আদর্শটি। সেই তপোবনে যে ঋষিরা সাধনা করতেন, তারা ছিলেন গৃহী, সঙ্গে থাকতো তাঁদের স্ত্রী, পরিজন। শিষ্যেরা সন্তানের মত তাঁদের সেবা করত বিদ্যালাভের উৎসাহে। আশ্রমের গরু চরানো, দুধ দোয়ানো, বনেজঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করা, অতিথিসেবা ইত্যাদি আশ্রমের সবরকম নিত্যকর্ম তাদেরই করতে হতো। কঠোর দৈহিক পরিশ্রম ও নিয়মনিষ্ঠ জীবনের অবসরে এই আশ্রমবাসীরা গুরুর কাছে উচ্চতম নানা জ্ঞানের শিক্ষা পেতেন। এই শিক্ষা আজকালকার মত কেবলমাত্র বইপড়ার শিক্ষা নয়, তা ছিল তাঁদের দেহমন ও বুদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শিক্ষা। এর মূলে ছিলেন গুরু, তাঁর জীবনই ছিল শিষ্যদের কাছে সবচেয়ে বড়

শিক্ষা। নিজের জ্ঞানচর্চার ভিতর দিয়ে গুরু আশ্রমের মধ্যে রচনা করতেন "কল্যাণের সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি।"

লোকালয় থেকে দূরে বিশ্বপ্রকৃতির নির্জন আবেষ্টনের মধ্যে এই আশ্রমগুলি গড়ে উঠতো। সেখানে অরণ্য, পাহাড়, নদী, সকাল-সন্ধ্যা, রাত্রি-দিন, চন্দ্র-সূর্য, পশু-পক্ষী, আকাশ-বাতাস, নানা ঋতুর বৈচিত্র্য কতভাবে, রসে, শব্দে, বর্ণে, গন্ধে, আশ্রমবাসীদের মনে বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরকার অনন্ত আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটিত করেছে। এইভাবে তপোবনের ঋষিরা চেয়েছিলেন প্রকৃতি, তরুলতা ও জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করতে। মানুষ যে বিরাট এক-এরই একটি অতি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ, এই অনুভূতির প্রতি ছিল তাঁদের লক্ষ্য। সেই কারণেই তখনকার নানা সমাজ তপোবনের জ্ঞানচর্চার জীবনকে অতিবড় সম্মান দিত এবং আশ্রমগুরুকে বলত ঋষি।

দেশের জনসাধারণ সাক্ষাৎভাবে এই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ছিল না। কিন্তু আর একভাবে এই আশ্রম-জীবনের শিক্ষা থেকে জনসাধারণ বিশেষ লাভবান হত। যখন ব্রহ্মচর্যের জীবন সমাপ্ত করে এই বিদ্যার্থীরা যৌবনে নিজেদের সমাজে ফিরে গৃহী হতেন, তখন সমাজ তাদের এতদিনকার আহরিত জ্ঞানকে নানাভাবে কাজে লাগাতেন; এবং এঁরাই হতেন তখন সেই সমাজের প্রকৃত চালক। তারপরে গার্হস্থ্যজীবনে সংসার ও সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নিয়ে, বৃদ্ধবয়সে স্বামী-স্ত্রীতে ফিরে যেতেন সেই তপোবনের সন্ন্যাসধর্মে, যাকে বলা হত বানপ্রস্থ। এইভাবে তাঁদের জীবনটি ছিল বিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এক একটি পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন। এঁরা মনুষ্যত্বের সাধনায় নিযুক্ত থাকতেন আজীবন, আর মানব সমাজ এঁদের এই এই সাধনার ফল ভোগ করত। সমাজের মঙ্গলার্থেই এঁদের জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজে এমন কতগুলি

ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যার ফলে সেই আবহাওয়ায় বাস করে তার ভালমন্দের একটা ছাপ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পড়তো।

তপোবনের শিক্ষায় বর্ধিত শিক্ষার্থীরা ছিলেন ধর্মভীরু, অধ্যাত্ম চিন্তাই ছিল তাঁদের জীবনের মূল ভিত্তি। এঁরা ইচ্ছা করলে আত্মোন্নতির চেষ্টায় একান্তে, সমাজের বাইরে, একলা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তা তাঁরা করেননি। সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্বের কথা তাঁরা কখনো ভোলেননি। সমাজের উপকারার্থে তাঁরা নানারূপ অধ্যাত্ম-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গণিতশাস্ত্র, অনিষ্টশাস্ত্র, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধপদ্ধতি, ভূগর্ভরত্নজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, বেদাঙ্গ শিক্ষাকল্পাদি, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (গন্ধদ্রব্যরচনা, নৃত্যগীতাদি), ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র ভালরকমে চর্চা করেছেন। সকলেই যে একসঙ্গে সবেরই চর্চা করতেন তা নয়; সামর্থ্য ও পছন্দমত বিদ্যার চর্চা হত। কেউ একটি বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন, কেউ করেছেন একাধিক বিষয় নিয়ে।

এইরূপ ধর্মকেন্দ্রিক সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ধারা আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগেও বৌদ্ধদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা থেকে শুরু করে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি নানা দেশে স্থাপিত ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত বিখ্যাত সব প্রাচীন বিদ্যাকেন্দ্রগুলি তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। এইসব বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ছিলেন গুরুরা, যাঁরা মানবের কল্যাণের চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। গুরুদের জীবনকে আদর্শ ব'লে স্বীকার করে দলে দলে ছাত্র আসত দেশ-বিদেশ থেকে সেই সব বৌদ্ধ-বিহারে। জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের একত্র সাধনাই ছিল এইসব বিহারের আদর্শ। এইসব বিহারকে ঘিরেই তখনকার যুগের নানাপ্রকার উচ্চজ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, নৃত্যগীতবাদ্য বিকাশ লাভ করে। বৌদ্ধমঠে নৃত্যগীতবাদ্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল, তার পরিচয় পাই তিব্বতে, চীন, জাপান ও কোরিয়ার বৌদ্ধ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের

দ্বারা। এই সব বিহার বা মঠের সন্ন্যাসীদের কেন্দ্র করেই সে যুগের চিত্রকলা, মূর্তি, স্থাপত্যশিল্প ভারতীয় সভ্যতাকে একটি বিশেষ গৌরবের আসনে বসিয়ে গেছে। এইসব বিহারগুলি সবই স্থাপিত হয়েছিল রাজধানী থেকে দূরে প্রকৃতির শান্ত আবেষ্টনের মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে তপোবন ও বৌদ্ধবিহারগুলি সমাজের প্রয়োজনে এবং সমাজের কল্যাণার্থে গড়ে উঠেছিল। এগুলি ছিল যেন মনুষ্যত্ব সাধনের এক একটি গবেষণাগার। আর সেই গবেষণার উদ্দেশ্যে যারা নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতেন, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু। এখানকার সাধনা কেবল প্রাণহীন নোট মুখস্ত করার সাধনা নয়, বা কেবল বুদ্ধির দ্বারা বিচারের সাধনা নয়। এই সাধনা চলত জীবনচর্যার সঙ্গে, দেহের রক্তমাংসের সঙ্গে এক ক'রে নিয়ে। এখানকার শিক্ষাকে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাণেরই অঙ্গবিশেষ বলে মনে করত। কেবল বক্তৃতার দ্বারাই গুরুরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতেন না, তাঁরা সেই মত নিজের জীবনকেও আদর্শরূপে শিষ্যদের সামনে সব সময় ধরতে চাইতেন। এ ছাড়া আশ্রম বা বিহারের জীবনের মধ্যে এমন একটি অনুকূল আবহাওয়া তাঁরা রচনা করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেই আবহাওয়াটির প্রভাবও বড় কম ছিল না। অর্ধেক শিক্ষা তার মধ্যেই তাঁরা গ্রহণ করতেন বিনা চেষ্টায়, বাকিটা গুরুর তত্ত্বাবধানে চেষ্টার দ্বারা। বিহার ও তপোবনের জীবন যে কিরকম সার্থক ছিল তার পরিচয় পাই সেই আশ্রমবাসী ঋষি ও বিহারবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা রচিত বিপুল ও ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্যের নমুনা থেকে। বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের গুহাবাস বা বিহারের যে ভগ্নাবশেষ আজও আমরা দেখি, তার থেকে তাদের মনুষ্যত্ব সাধনার সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের একটি পরিষ্কার পরিচয় মেলে। বেশ অনুভব করি সে-যুগের মনুষ্যত্ববোধ এ-যুগের তুলনায় কতখানি উন্নত ছিল এবং তা ছিল বলেই সে যুগের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য আজও আমাদের কাছে প্রেরণার বিষয় হয়ে আছে। এ

যুগের আমরা প্রাচীন সেই সব গুহা বা বিহারের সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে যাই বিস্ময়ে এবং ভাবি মনুষ্যত্বের সাধনা কতখানি সফলতা লাভ করতে পারলে না জানি এমনটি সম্ভব।

পূর্বেই বলেছি এঁদের এই সাধনা ছিল সমগ্র মানবের মঙ্গলের সাধনা। তাই গ্রামকেন্দ্রিক প্রাচীন ভারতের সমাজে এই সাধনার ধারাকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল যে, গ্রামে বাস করে গ্রামবাসীরাও এই সাধনার ফল থেকে বঞ্চিত হতো না। কারণ তাঁরা এটা জানতেন যে, সমগ্র মানব সমাজের ক্ষুদ্র অংশবিশেষ তপোবনবাসী মুনি বা বিহারবাসী ভিক্ষু বা শ্রমণদের মধ্যেই যদি কেবল এই সাধনার কাজ বদ্ধ থাকে তবে তা বিফল। সকলের জন্যে যে সাধনা চলেছে তার ফল সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেইজন্যে গ্রামের সাধারণ জীবনের সঙ্গে ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নানা শিল্পকলা ও অভিনয়ের একটা সহজ আবহাওয়া রচনা করে দেবার চেষ্টায় তাঁরা ছিলেন, এবং সে পথে কৃতকার্যও হয়েছিলেন।

তপোবন ও বিহারের শিক্ষায় ছিল কঠোর পরিশ্রমসাধ্য একটি সাধনার ধারা। অত্যন্ত একাগ্র চিত্তে, ধ্যানের জীবনের সাহায্যেই তা প্রকাশ পেত। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করা বা আয়ত্ত করা সব সময় সহজ হত না। গ্রামের জীবনে আমরা সে সাধনা আশা করতে পারিনা, কারণ সংসারের নানাপ্রকার আলোড়নের মধ্যে তাদের মন থাকে বিক্ষিপ্ত হয়ে। তাই এই সব সন্ন্যাসীরা গ্রামের সমাজের জন্যে যে পথ আবিষ্কার করলেন সে পথে যদিও সন্ন্যাসী পরিচালিত [illegible] কঠোর সাধনা নেই, কিন্তু তাতে মনুষ্যত্ব সাধনার পথে এগোবার সুযোগ করে দেওয়া হল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বস্তুনিরপেক্ষ ভারতীয় দর্শনের গভীর চিন্তা জনসাধারণের পক্ষে সহজে অনুভব করা সম্ভব ছিল না বলেই তাকে দেবদেবীতে রূপ নিতে হল, এবং তাদের ঘিরেই কত রকমের

পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে সেই সব দুরূহ কথাগুলিকে ঘুরিয়ে বলা হল। প্রাচীন ভারতের বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠলো কেবল এই কারণে। এ ছাড়া গ্রামজীবনের সঙ্গে দিন, মাস ও বৎসরে নানাপ্রকার কাজ, অনুষ্ঠান ও উৎসবের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে মনুষ্যত্ববোধের চিন্তাকে কত সহজেই না এক করে দেওয়া হয়েছিল। আজকাল বাইরে থেকে দেখতে সেই সব সামাজিক অনুষ্ঠানের অনেক কিছুকেই অনাবশ্যক বলে মনে হলেও তখনকার দিনের ধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক শিক্ষার পথে এসব একেবারেই নিরর্থক ছিল না। এইসব উৎসব অনুষ্ঠান ও দৈনিক ক্রিয়াকর্মের সাহায্যেই গ্রামের লোক একসঙ্গে জ্ঞান, ধর্মচিন্তা শিল্প, সাহিত্য, গীতবাদ্য, নৃত্য, অভিনয়াদি ও এই সব উপলক্ষ্যে নানা প্রকার সাজ-সজ্জার ভিতর দিয়ে সৌন্দর্যবোধের একটা সহজ অথচ স্বাভাবিক আবহাওয়া গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং সব ক্ষেত্রেই উন্নত রুচিবোধের একটা ভাল মান তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এই ভাবে প্রাচীনেরা একটি সহজ আবহাওয়া সৃষ্টি করে গ্রাম-সমাজকে মনুষ্যত্ববোধের পথে সজাগ রেখেছিলেন। বলতে গেলে শিক্ষার পথে তপোবনের যুগ, বৌদ্ধযুগ, প্রায় এক আদর্শে এবং এক পথে ভারতকে নিয়ে গেল। এর পরে এল মুসলমান যুগ তার ভিন্ন ভাবধারা নিয়ে। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের বড় বড় প্রাচীন কেন্দ্রগুলির প্রায় সবই ধ্বংস হল।

এযুগে সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ব্যবস্থা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। মস্‌জিদ্ ও মক্তবকে ঘিরে দেখা দিল উচ্চতর মুসলমান শাস্ত্র ও স্থাপত্যকলার চর্চা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার চর্চা হতে লাগল নবাব ও সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এ যুগে বৌদ্ধরা ভারত থেকে প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হিন্দুদের বড় বড় মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি মুসলমানদের উচ্চাঙ্গের শাস্ত্র-চর্চার ও স্থাপত্যকলার বড় কেন্দ্র হয়ে উঠলো। উচ্চাঙ্গের নৃত্যগীত ও চিত্রকলার চর্চা হতে লাগল এইসব মন্দিরকে ঘিরে, যার নমুনা দক্ষিণ ভারতে আজও কিছু

পাই। কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের যে ধারাটি প্রাচীনেরা চালু করে গিয়েছিলেন, গ্রামবাসীরা তখনো তা হারালনা। গ্রামের পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠি নামে ছোট-বড় নানা বিদ্যালয়ের সাহায্যে, নানাপ্রকার কুটির-শিল্প, পুজা-পার্বণ, আমোদ-আহ্লাদ, উৎসবাদি, নৃত্যগীত, যাত্রা, কথকতা, ব্রতাদির ভিতর দিয়ে গ্রামোপযোগী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ধারাটি বয়ে চলতে লাগল। দেশের রাজনৈতিক উত্থান পতন কত কি ঘটে গেল, তার ধাক্কায় বড় বড় জ্ঞানের বহুকেন্দ্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হল, অথচ গ্রামে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাটি ধ্বংস হল না; রইল বেঁচে আপনার জোরে। সেইজন্যেই গ্রাম থেকে ডেকে নেওয়া হয়েছে জ্ঞানবীর, কর্মবীর, আনন্দের সাধক নানা শিল্পীদের রাজদরবারে, ধনীদের আসরে। তখনো রাজাদের রাজধানীতে রাজসভা সাজাতে হতো গ্রাম থেকে ডেকে-আনা গুণীদের নিয়ে। রাজধানীতে গুণী তৈরী হয়েছে এমন খবর খুব কমই শোনা যায়।

গ্রামের এই গৌরবময় প্রাধান্য মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যন্তই প্রায় অটুট ছিল। তা নষ্ট হতে শুরু করে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ থেকে এবং এই শাসনব্যবস্থা গত দুই শতাব্দীর মধ্যে গ্রামের জীবনকে সব বিষয়ে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছে। বর্তমানে আমরা গ্রামের যে মৃতপ্রায় নিরানন্দময় জীবনযাত্রার নমুনা দেখছি এই হ'ল সেই কুশাসনের বিষময় ফল। এরাই গ্রামের স্বাবলম্বনের শক্তিকে ধীরে ধীরে খর্ব করেছে। আজ গ্রাম সব দিক থেকে এমন অসহায় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, দেখে মনে হবে গ্রামকে বোধহয় তার পুরাতন গৌরবের আসনে বসানো যাবে না।

প্রাচীনের সঙ্গে আমাদের দেশের ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাধারার প্রধান পার্থক্য হ'ল এই যে, এ শিক্ষাপদ্ধতি সমগ্রভাবে সমাজের মঙ্গল কামনা বা মনুষত্বের বিকাশের পরিকল্পনা থেকে উদ্ভুত নয়। জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের একত্র সাধনার দ্বারা মানুষ গড়বার আদর্শ এর সামনে নেই। বড় আদর্শের কথা ছেড়ে দিয়েও আমরা যদি কেবল লেখাপড়া

জানার দিক্ থেকে বিচার করি, তাহলেও দেখতে পাবো যে, ইংরেজ রাজত্বের যুগে তারও কি রকম পতন হয়েছে। যে যুগে শতকরা ৭০।৭৫ জন লোক লিখতে পড়তে পারত, ইংরেজ যুগে তার সংখ্যা কমতে কমতে এসে দাঁড়াল শতকরা ৮।১০ জন মাত্র। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠল রাজধানীতে শহরকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে। সেখানে প্রাচীন যুগের মত মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সাধনা বন্ধ হ'ল। শুরু হ'ল শতকরা ৮।১০ জন দেশবাসীর মধ্যে সাধারণভাবে কতকগুলি বই পড়ার বিদ্যার প্রচার, যার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষায় গুরুর জীবন শিক্ষার্থীদের জীবনকে কোন বড় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে না। পঠন-পাঠন চলে একনিয়মে, গুরু ও ছাত্রদের জীবনের গতি আর এক দিকে। জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের একত্র যোগে যে মনুষ্যত্বের সাধনার কথা প্রাচীনেরা বলতেন, বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তার কোন পরিচয় নেই। বই পড়া ও লিখতে পারলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল ব'লেই আমরা মনে করি। মনে করি, শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে তার যোগ না থাকলেও চলে। আরো মনে করি, এ শিক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের, আনন্দের চর্চার স্থান না থাকাই উচিত, যে কারণে এতদিন পর্যন্ত নৃত্য গীত-বাদ্য অভিনয় ও নানারূপ শিল্পকলার চর্চা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কি সাধারণ বিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষাপদ্ধতি গ্রামসমাজে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি কিন্তু এরই প্রাধান্যে গ্রামের প্রাচীন ধারার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও নষ্ট হ'য়ে গেল। শিক্ষা যে মনুষ্যত্ব সাধনারই প্রয়োজনে যুগে যুগে চালিত হয়েছে, বর্তমান যুগের ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেকথাটা সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। আমরা, আজ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত ব'লে অহংকার করি, তারা ভারতের চিরকালের শিক্ষার আদর্শে যে কতখানি অশিক্ষিত তা ভাবা উচিত। আমাদের দেশের এ যুগের চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যে কয়েকজন এই

কারণেই বারে বারে সতর্ক করে ব'লেছিলেন যে, দেশের বর্তমান শিক্ষাধারা আমাদের মানুষ করে না, আমাদের কয়েকটা বই মাত্র পড়ায়। এই শিক্ষার পরিবর্তন আবশ্যক। ৫০ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুনভাবে প্রথম চিন্তা ক'রেছিলেন পূজনীয় গুরুদেব এবং হাতে কলমে সেই পথে কাজও শুরু করলেন তখনই। আজ বিশ্বভারতীকে যেভাবে দেখছি এ হ'ল তাঁর সেই চেষ্টার প্রকাশ মাত্র। বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়ে তিনি শিক্ষার যে আদর্শ প্রচার করলেন তার সঙ্গে প্রাচীন যুগের তপোবনের ও বৌদ্ধ বিহারের শিক্ষার আদর্শের বহু পরিমাণে মিল আছে, যেখানে ধর্ম, কর্ম ও আনন্দের একত্র প্রকাশকেই আদর্শ ব'লে মানা হ'ত।

এযুগে বাংলাদেশে তিনিই প্রথম শহরবাসীদের মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরে নিশ্চিন্তে বাস করার কু-অভ্যাসের দিকে তিনি দেশকে বারে বারে সতর্ক করেন। তিনি শহরবাসী রাজনীতিকদের ডেকে বলেছিলেন যে, গ্রামে প্রাচীন আদর্শের স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে যদি আমরা আবার ফিরিয়ে আনতে না পারি, তবে আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নেই। তিনি বলেছিলেন, গ্রামগুলি যাতে নিজের জ্ঞানের, কর্মের ও আনন্দের পরিবেশ রচনা ক'রে আদর্শ গ্রামরূপে পরিণত হয়, গ্রামের মানুষের মধ্যে সেইরূপ আত্মচেতনাবোধ জাগাতে হবে; গ্রামবাসীরা যেন নিজেদের অসহায় মনে না করে, দেশের ধনীদের ও দেশের সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষা না করে। নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টায় গ্রামের স্বাস্থ্য ও খাদ্য ইত্যাদি সমস্যার সমাধান ও নানা আনন্দের আয়োজনে গ্রামকে আনন্দময় করে তুলতে বলেছিলেন।

প্রায় ১৯১২০ বছর হতে চল্‌লো ভারতের আর এক মহাপুরুষ "মহাত্মাজী" যে নূতন শিক্ষাপদ্ধতির কথা বল্‌লেন তা হল "নঈ-তালিমী" শিক্ষাপদ্ধতি। এ পদ্ধতিও সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের সাধনার কথাই বলল এবং ভারত যুগ যুগ ধরে ...ক সংস্কৃতির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন

করেছিল, এ পদ্ধতি চলতে চেষ্টা করেছে সেই পথ ধরে। এযুগে ভারতবর্ষ যদি পৃথিবীকে শিক্ষার পথে নূতন কিছু দিয়ে থাকে তবে তা হল গুরুদেবের শিক্ষাকেন্দ্র "বিশ্বভারতী" আর মহাত্মাজী স্থাপিত "নঈ-তালিমী" বিদ্যালয়।

গুরুদেবের "শিক্ষাসত্র" ও মহাত্মাজীর 'নঈ-তালিমী' শিক্ষা

গুরুদেব চেয়েছিলেন মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সুযোগ ও সুবিধার জন্যে এ যুগের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। বিশ্বভারতী স্থাপিত হল সেই উদ্দেশ্যে। এখানকার শিক্ষাদর্শ যে কি হওয়া উচিত, তার ব্যাখ্যা গুরুদেব এইভাবে করেছিলেন,—

"...education should be in full touch with our complete life, economical, intellectual, aesthetic, social and spiritual ;" কারণ তিনি মনে করতেন

"fullness of expression is fullness of life."

মানুষের পেটের ক্ষুধা ও মনের ক্ষুধার সুষ্ঠু নিবৃত্তিতেই মানুষের পূর্ণতা। মানুষের জীবনে দুটিরই সমান প্রয়োজন। যে-কোন একটিকে অস্বীকার করে মানুষের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। তাই বিশ্বভারতী স্থাপনার কিছু পূর্বে, তার আদর্শ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—

"Our centre of culture should not only be the centre of the intellectual life of India, but the centre of her economic life also. It must cultivate land, breed cattle, to feed itself and its students ; it must produce all necessaries, devising the best means and using the best materials, calling science to its aid. Its very existence should depend upon the success of its industrial ventures carried out on the

co-operative principle, which will unite the teachers and students in a living and active bond of necessity. This will give us also practical industrial training, whose motive force is not the greed of profit."

মনুষ্যত্ব বিকাশের এইরূপ একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা সামনে রেখে গুরুদেব বিশ্বভারতীকে সাজাতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যে দেখি, এক-দিকে শান্তিনিকেতন অপরদিকে শ্রীনিকেতন। একটি হল মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির ও অপরটি হল পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রতিষ্ঠান। শান্তি-নিকেতনে আছে পাঠভবন, শিক্ষাভবন, কলাভবন, সংগীতভবন, বিদ্যা-ভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন ইত্যাদি। ওদিকে শ্রীনিকেতনে আছে শিক্ষাসত্র, শিক্ষাচর্চাভবন, শিল্পভবন, পল্লীসেবা বিভাগের দ্বারা পরিচালিত গ্রাম উন্নয়নের নানারূপ শাখা প্রশাখা, কৃষি বিভাগ, গোশালা ইত্যাদি আরও নানারূপ প্রচেষ্টা। এইভাবে সব নিয়ে বিশ্বভারতী এবং একে ঘিরে আরো কতরকমের ছোটখাটো কাজ চলেছে। শ্রীনিকেতনের কাজের নানা শাখার মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত একটি বিভাগের নাম "শিক্ষাসত্র"। শ্রীনিকেতনের আশেপাশের গ্রামের দরিদ্র বালকদের জন্যে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি। এই বিদ্যালয়টি নিয়ে আলোচনার পূর্বে এবিষয়ে গুরুদেবের জীবন ও তাঁর চিন্তার পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে জেনে রাখা দরকার।

শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই জানেন যে, গুরুদেবের জন্ম কলিকাতা শহরে। তিনি প্রথম বয়সে শহরেই মানুষ এবং পল্লীজীবনের কোনো স্পর্শ প্রথম বয়সে তিনি পাননি। কিন্তু বছর তিরিশের মত বয়স থেকে যখন তাঁর উপর জমিদারী পরিচালনার ভার পড়ল, তখন তিনি দেখলেন যে ভাল করে জমিদারী চালাতে হলে প্রজাদের মধ্যে গিয়েই বাস করাই উচিত। তা না হলে প্রজাদের সুখ-দুঃখের প্রকৃত পরিচয় জানা যায় না। তখন থেকে একটানা প্রায় বারো বৎসর উত্তর বাঙলার নদীমাতৃক পল্লী অঞ্চলে, নিজেদের জমিদারীতে প্রজাদের

মধ্যে কাটালেন। তখনই তিনি জীবনে প্রথম বাঙলার পল্লীগ্রামের নিকট সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান। তাই বলেছেন—

"শিলাইদা পতিসর এইসব পল্লীতে যখন বাস করতুম, তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি।······প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ, নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি, নদী, প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছায়া-তরুতলে তাদের কুটির; আর একদিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।

যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম, ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল।······ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট ক'রে উঠেছিল।

আজকার গ্রামবাসীদের মতো নিরানন্দ জীবন আর কারো কল্পনাও করা যায় না। যাদের জীবনে কোন সুখ কোন আনন্দ নেই, তারা হঠাৎ কোন বিপদ বা রোগ হলে রক্ষা পায় না।

যারা বহু যুগ থেকে এই রকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্থ নয়, তাদের উপকার করা বড়ই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ।

তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, পল্লীর কাজ করতে হবে।··· নানাভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলুম।"

এই ইচ্ছা থেকে পরে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক প্রথায় ভাল করে কৃষিবিদ্যা, গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসবার জন্যে আমেরিকার এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠালেন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ, বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র ও জামাতা নগেন্দ্রনাথকে। কিনলেন শান্তিনিকেতনের নিকটেই নীলকুঠির আমলের বাড়ী ও জমি। কিন্তু পল্লী জীবনের সেবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা সামনে রেখে কাজ শুরু করতে পারলেন তখন, যখন গুরুদেবের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁরই আমন্ত্রণে, ভারত

বন্ধু ইংরেজ মিঃ এলমহার্স্ট এসে ১৯২১ সালে এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ হল তখনই।

গুরুদেব বলেছিলেন, দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস, স্বাস্থ্যহীনতা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা একসঙ্গে এমন প্রবলভাবে জড়িয়ে আছে যে, সবগুলিকে একই সঙ্গে তাড়াবার চেষ্টা না করলে গ্রামকে বাঁচানো যাবে না। কোন একদিক নিয়ে কাজে নামলে কাজে সফলতার আশা কম। তাই গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের একটা পরিকল্পনা নিয়ে শ্রীনিকেতনের কর্মীরা আশে পাশের কয়েকটি গ্রামে কাজে নেমে পড়েন। কিন্তু কাজের মূল কেন্দ্র হল শ্রীনিকেতন। গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে যেসব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, তার একটি তালিকা দিচ্ছি। শুরু হল কৃষি, মুরগী, চামড়া, তাঁতের ও কাঠের কাজের বিভাগ। উদ্দেশ্য হল গ্রামের লোকদের সামর্থ্যের মধ্যেই কি করে ক্ষেতে অধিক ফসল ফলান যায়, ভাল মুরগীর চাষ হয়, ভাল গরু দ্বারা গ্রামে দুধ ঘি তৈরী করতে পারে গোয়ালারা, ব্যবসাহীন মুচীদের অর্থকরী চামড়ার ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা, তাঁতি ও ছুতোরদের পরিত্যক্ত কাজে ফিরিয়ে আনা। কারণ এইসব নিয়ে যারা এতকাল ধরে বংশানুক্রমে ব্যবসা করেছে, সেই লোকেরা সকলেই কাজ ছেড়ে দিয়েছিল ব্যবসায় কলের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে।

ডাক্তারের সাহায্যে গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য ওষুধ বিতরণ ও ম্যালেরিয়া নিবারণের কাজ চলতে লাগল। সমবায় সমিতি করা হল। তার কাজ হল একজোটে গ্রামের রাস্তা তৈরী করা বা মেরামত করা, জল নিষ্কাশণের নালা তৈরী করা, জলসেচের পুকুর ও ডোবা পরিষ্কার ও নিয়মিত কেরোসিন দিয়ে মশা ধ্বংস করা। নিয়মিত গ্রামের অধিবাসীদের কুইনাইন খাওয়ানো। ব্রতীবালক দল গঠন করে তাদের গ্রামের সেবার কাজে লাগানো। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে ও স্কুলে সব্জিবাগান করা। তা ছাড়াও বালিকা বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, লাইব্রেরী ইত্যাদি বহু বিষয় এক সঙ্গে হাতে নিয়ে কাজ শুরু হল

পাঁচটি গ্রামে। গ্রামের বালকদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি নতুন পরিকল্পনা এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২২ সালে রচিত হল। ইংরেজী ভাষায় তার নাম দেওয়া হয়েছিল "Home Project"। মিঃ এলমহার্স্ট ঐ সময় একটি বক্তৃতায় এই শিক্ষা পরিকল্পনার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে যা বলেছিলেন তার অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি। তিনি বলেন—

"By the Home Project is meant some hobby, such as may be carried on at home by the boy, which can be easily supervised by the teacher and which has a definite economic value attached to it, thus from an early age getting every boy in the village accustomed to do his part in the earning of the family living.

"The natural ambition of every boy is to be like his father, to create something and to earn something,

"The Home Project may also be weaving or poultry or bee or calf-keeping ; or, with the girls, food preserving or sewing ; but the garden in the first instance has tremendous advantages......

"The proper sanitation of the village can only come about when the proper use of night soil in the garden is understood, as well as its economic value.

"In the proper laying out of the garden, in the keeping of a complete set of cost accounts, the young farmers will not only require, but will demand, instruction in all the geometry and arithmetic that they are likely to need in the village in after life ;

......in the case of home plot......there is always some one at home to see that the goats and cows do not stray into the Project Garden.

"At the same time, under proper guidance, there will be no farther need for compulsion in the practice of essay writing and book reading. Experience shows that the boy will soon realise the value of properly written memoranda, and will grasp at any literature which

likely to help him to advance his Project, and thus, with proper stimulation, unlimited fields of discovery will open out before him. Botany, Chemistry, Physics, Bacteriology, Geology, Entomology or in better parlance, the study of the Earthsurveying, levelling, soil-testing, of water-reservoirs, drainage-channels, navigable rivers, of woody and non-woody plants, of Mammals, of Reptiles, of Insects, and of Birds, each in direct relation to the Home Project.

"......the School master who is able to organise scouts and to supervise Home Project gardens, will be so invaluable to the village that there should be little dffi-culty about finding from village itself, the funds to support him.

The greatest benefit of the Scout-cum-Project method of training is that it allows each boy to develop along his own line within certain social bounds, instead of taking a number of boys with an infinite variety of differences and moulding them in to one pattern, with many anti-social tendencies in common."

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করে তোলার ভার পড়ল গ্রামের শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর। শ্রীনিকেতনের কর্মীরা তাদের নিয়ে রচনা করলেন একটি করে ব্রতীবালক দল। এই বালক ব্রতীদল গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, সেবা ইত্যাদির কাজে বিশেষভাবে তৈরী হতে লাগল। তাদের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল "Home Project" আদর্শে। ব্রতীদলই ছিল এইরূপ কারিগরী শিক্ষার প্রথম ছাত্রদল। মাতৃভাষা স্বভাবতই শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার হত। বিদেশী ভাষার কোন স্থান ছিল না। কারণ গুরুদেব ভাল করে জানতেন যে "দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে"।

প্রায় একটি বছর এই পথে কাজ করার পর তার ফলাফল দেখে উৎসাহিত হয়ে মিঃ এলমহার্স্ট লিখেছিলেন,—

"One year's experience, in an entirely new field has given such promising results, that there is ample ground

for hope. The whole staff was inexperienced, and none of the students were trained. They have taught themselves by the Project method, and they have already passed on to the villagers something of what they have learnt."

এই কাজের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা এইটুকুও বুঝেছিলেন যে,

"It is not only money that is needed to-day...but men who after learning how to co-ordinate the use of hand and brain themselves, will go out and stimulate the villager to make full use of all the great resources at his disposal, and who will train the boys and girls to light a new lamp and show a new way out of the miseries which have overwhelmed this unfortunate province."

এই শিক্ষা পদ্ধতিতে গ্রামের আনন্দের কথাও বিশেষ করে বলা হয়েছিল। ব্রতীদলের খেলাধূলা ও নানারূপ শিল্পের চর্চা, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে তাদের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষেরও সাহায্য করা হত। কারণ গুরুদেব বিশ্বাস করতেন যে,

"......the poverty problem is not the most important, the problem of unhappiness is the great problem.

"It is fullness of life which makes one happy, not fullness of purse.

"Our object is to try to flood the choked bed of village life with the stream of happiness, for this the scholars, the poets, the musicians, the artists have to collaborate, to offer their contributions."

দরিদ্র পল্লীজীবনের উপযোগী এই শিক্ষাদর্শকে ভিত্তি করে বছর দুই পরে ঠিক করা হল যে এই পথের উপযোগী একটি স্থায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার যেখানে সব জাতের দরিদ্র ছাত্রদেরই শিক্ষা দেওয়া হবে। এমন কি যারা পয়সা খরচ করে পড়াশুনা করতে পারে না, তারাও এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে এবং শিক্ষান্তে ফিরে গিয়ে যেন তারাই এই আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের গ্রামকে পরিচালিত করতে পারে। প্রথমে বিদ্যালয় স্থাপিত হল শান্তিনিকেতনে পূর্ব

প্রান্তে একটি টিনের চালা ঘরে, ছ'টিমাত্র ছাত্র নিয়ে। বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন ৺সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। গুরুদেব এর নাম দিলেন 'শিক্ষাসত্র'। এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ ছাত্ররা নিজ হাতে সম্পন্ন করত। রান্না, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা, ফুলের ও সব্জি বাগান করা, মুরগী পালন, গো পালন, নিজেদের পরনের জামা ও পাজামা নিজেদের হাতে তৈরী করত। এই সব হাতের কাজের সমন্বয়ে চলত নানারূপ সাধারণ জ্ঞান ও পড়া লেখার কাজ। আর বাঙলাদেশের গ্রামের ছেলেদের মুখের ভাষাই ছিল এই সব শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের জন্যে নাটকের অভিনয়, গান, ছবি ইত্যাদি কলারও স্থান ছিল। পড়া করত গাছের তলায়, মাটিতে আসন পেতে। নিজেদের বসবার সেই আসন নিজেরাই করে নিয়েছে। জীবনযাত্রার মান ছিল অতিশয় সহজ ও সরল। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সঙ্গে এর কোন যোগ ছিল না। সুতরাং পরীক্ষার বা উপাধির কোন মোহ এদের মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এরা যখন পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে বেড়াতে যেত শান্তিনিকেতনের বাইরে তখন প্রকৃতি ও আশে পাশের লোকজন, তাদের প্রাচীন ইতিহাস, জীবনযাত্রা ইত্যাদির নানা খবর তারা সংগ্রহ করত আপন আনন্দে ও জানবার আগ্রহে। সকালে প্রাতোত্থানের পরে ও সন্ধ্যায় দিনের সমস্ত কর্মশেষে উপাসনা, গান ও মন্ত্রপাঠ দ্বারা নিজেরা যে একটি আবেষ্টন তৈরী করত, ধর্মচিন্তার পথে এইটুকুই গুরুদেব মনে করতেন যথেষ্ট।

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে এর কর্মপথে বিশেষ পার্থক্য নেই। মনে হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে উভয়েই এক পথের যাত্রী। গুরুদেব শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় বুদ্ধি ও চিত্তের ঐশ্বর্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃতিত্ব শিক্ষাকেও ছাত্রজীবনে সমান স্থান দিয়েছিলেন। এবিষয়ে তাঁর নিজেরও মত হল,—

'ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ, তখন ধন-লাঘবকে সে ভয় করত না লজ্জা করত না, কেন না, তার প্রধান লক্ষ্য

ছিল অন্তরের দিকে।……তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক পরমার্থিককে মিলিয়ে।…

কৃত্তিত্ব শিক্ষা অত্যাবশ্যক হোলেও এই যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে।……চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?"

শান্তিনিকেতনে ছাত্ররা চিত্তের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠুক গুরুদেব সে কথা যেমন ভেবেছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন দেহের কর্ম-শক্তিকে নানারূপ বিচিত্র কাজের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করুক। তাই শান্তিনিকেতনে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, ছাত্ররা সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বোধের চর্চার সঙ্গে আত্মনির্ভরক্ষম হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অনুশীলনের দ্বারা। দ্রব্যের পরিজ্ঞান ও পরিমাণ সম্বন্ধে যথাতথ্য। কাঠ, মাটি, শস্য, সুতো, খনিজ সংগ্রহের দ্বারা ঐ কাজ করা। নানা রঙের সঙ্গে সা রে গা মা স্বর-বৈচিত্র্য বোধ। পর্যবেক্ষণ শক্তির ব্যবহার ও ফল লিপিবদ্ধ করা। এর মধ্যে গাছপালা, পশুপাখী, গ্রামের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবজ্ঞা যেন না থাকে। গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ। ধর্মানুষ্ঠান, ভূতপ্রেতের বিশ্বাস, চিকিৎসা, জন্মমৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতির অনুসন্ধান ও লিখন। দুঃখ দুরবস্থার কারণ সন্ধান। ছাত্ররা ভ্রমণে যাবে। এতে করে কর্মক্ষম, ক্লেশসহিষ্ণু হওয়া, নানা স্থানের লোকযাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন ও রক্ষা যোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করার সুযোগ হয়।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও আবহবিদ্যা, ডাক্তারের সাহায্যে শারীর ও যন্ত্রাধ্যক্ষের সাহায্যে যন্ত্রবিদ্যার চর্চা করবে! ঘর তৈরী, ঘর মেরামত, ছুতোরের কাজ, তাঁতের কাজ, বাগানের কাজ শেখা। সাবান, কালি, কাগজ তৈরী করার পদ্ধতি জানা। ছাত্রাবাসের সামনের জমিতে নানাভাবে সাজানো বাগান রচনা করা। ঘর, বেশভূষা, শয্যা, আসন, দেহ পরিষ্কার রাখা। আসবাবের শৃঙ্খলা, পরস্পরের দ্রব্য ব্যবহার না

করা। প্রত্যহ প্রাতে পরস্পরকে নমস্কার ও শিক্ষককে প্রণাম করা। গুরুজন বা অতিথি গৃহে প্রবেশ করলে তাকে অভিবাদন। ভৃত্যদের অবমাননা না করা। বিদ্যালয়ের উৎসব ও আমোদে তাদের আমন্ত্রণ করতে হবে। ছাত্ররা নিজেদের ছাত্রাবাসে অন্য ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করে আমোদের ব্যবস্থা করে তাদের মনোরঞ্জন করবে ও সেই উপলক্ষ্যে ঘর সাজাবে।

ছাত্ররা পড়াশুনা করবে গাছের ছায়ায় বসে আসন পেতে মাটিতে। এমন কি এখানকার সাহিত্যসভা, ঋতু উৎসব, নাটক অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান, অভ্যর্থনা ইত্যাদি নানারূপ সভা-সমিতি উৎসবে উন্মুক্ত আকাশের তলায় বা বাগানের ছায়ায় মাটিতে। ব্রতীদল গ্রামের নানারূপ সেবার কাজে অংশ নেবে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্যে যতটুকু না হলে নয় কেবলমাত্র সেইটুকুই যেন এখানে ব্যবহার করা হয়।

ছাত্রদের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা রূপ পাবে গানে, গল্পে, অভিনয়ে, নানা শিল্প সাহিত্য কাব্য চর্চায়, খেলাধুলায়, ভ্রমণে ও প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের আবেষ্টনে নিজেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিয়ে।

ধর্মাচরণ বিষয়ে গুরুদেব মনে করেছেন যে, যদি তা মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকতা হয়, "তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক।" এবং সে স্থান রচিত হতে পারে সেইখানে, যেখানে 'বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে……। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির, স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গল কর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান।"

এখানে, ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় প্রকৃতির নির্জন আবেষ্টনে চুপ করে অল্পক্ষণের জন্যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী বসে থাকবে। দিনের কর্মারম্ভের পূর্বে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সকলে একসঙ্গে করবে উপাসনা

গান ও মন্ত্র পাঠ। প্রতি বুধবারে ও বিশেষ বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে উপাসনা-মন্দিরে হবে উপাসনা, আলোচনা। অতি প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগ করে ও রাত্রে শয়নের পূর্বে, নির্জন ও শান্ত প্রকৃতির আবেষ্টনে একযোগে গাইবে বৈতালিক গান।

এইভাবে তিনি শান্তিনিকেতনে কর্মে, ভাবে ও ধ্যানের আবেষ্টনে ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের একটি ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন। শিক্ষাদান কার্য চলত একসঙ্গে এরই মধ্যে বাস করে। তাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ বিষয়ে আলোচনাকালে বলেছেন—

"How to live a complete life is, according to me the purpose of education."

কিন্তু তবুও পাশেই আলাদা করে শিক্ষাসত্রকে রচনা করা হল কেন? এর উত্তর গুরুদেব নিজেই দিয়ে গেছেন। তিনি ১৯৩০ সালে এক বক্তৃতায় বলেছেন,— .

"......these students (of Santiniketan) who came from comparatively rich families, all want to pass their examination and get their degrees in order to earn their livelihood. Therefore it is not possible to give them the ideal kind of education. For instance, they cannot waste their time in manual training or even in such cultural training as music and art, and they want to cram themselves for their examination and somehow get through. I had to submit to this because otherwise there would be no chance of having a single student in my school......

"So I had to start a parallel school where the villagers who do not have ambitions for finding government employment, an employment in merchant's offices, come and join. There I am trying to introduce all my methods which I consider to be absolutely necessary for a perfect education. Before long, this village school, I believe, will be the real school, the ideal school, and the other one will be neglected....

"So we hardly have any institutions for training the peasants or the working men in order to do their own vocation properly in an educated manner. I think the only exception in Bengal which I may mention is this school which I have started in the neighbouring village near our institution."

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর পর ১৯২৬ সালে বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হল গ্রাম উন্নয়নের সর্বাঙ্গীণ কর্মস্থলের মধ্যে। এইখানে দুই বৎসর কাজ চলার পর ১৯২৮ সালে শিক্ষাসত্রের কাজের বিষয়ে বাৎসরিক বিবরণে তার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিষয়ে আবার বলা হল,

"From the very beginning children as introduced to some special craft which may be easily grasped by small hands and which is of definite economic value. The products should be to real use at home and should command ready sale outside, and thus enable the child to realize his capacity for self-preservation through the trained experience of his hands. The literary side is by no means neglected, and is intimately connected with their actual experience in daily life."

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার দিক্ থেকে আরম্ভে শিক্ষাসত্রে সব্জি বাগানকে যদিও প্রাধান্য দিয়েছে তবু প্রয়োজন মত অন্য কর্মের সাহায্যেও কাজ হতে পারে এমন কথাও বলা হয়েছিল। শিক্ষাসত্রে প্রত্যেক ছাত্রের জন্যে ছোট একটি জমি থাকা চাই। এই ক্ষেত্রের কাজ থেকেই কত রকম বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্যের যে অবতারণা করা হোতো তার একটি তালিকা তুলে দিচ্ছি—

"From the first the child should feel that this plot is playground as well as experimental farm, where it will try its own experiments as well as carry out the planting, tending and harvesting of some definitely profitable crop.

Records are kept and reports and accounts written up, revised and corrected, giving scope for literary training

in its most interesting form. Geology becomes the study of the fertility of the plot ; Chemistry the use of lime and manures of all kinds, of sprays and disinfections ; Physics the use of tools, of pumps, the study of water-lifts and oil-engines, Entomology the control of plant pests (ants, caterpillars, beetles) and diseases (leaf curl, wilt and bacterial attacks) ; Ornithology the study of birds in their relation first to garden plot and then to the world in general. Nature study is thus transformed into the study of Nature in relation to life and the daily experiences of life."

এইভাবে সব কাজের মধ্যেই ছাত্রের জীবনের সঙ্গে আন্তরিক যোগরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অর্থাৎ নিজে হাতে কাজ করতে করতে সেই কাজের সহায় স্বরূপ নানারূপ শিক্ষার প্রচলন করা অথচ তা কার্যকরীও হবে, এই হল শিক্ষাসত্র শিক্ষাদর্শের মূল কথা।

বুনিয়াদী শিক্ষানীতিতে মহাত্মাজী বলেছেন—

"I would...begin with the child's education by teaching it a useful handicraft enabling it to produce from the moment it begins its training.

"I had that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education.

"I want to teach through handwork all other subjects such as History, Geography, Arithmatic, Science, Language, Painting and Music."

উভয়েই হাতের কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের জীবন তৈরী করবার কথা বলেছেন। তবুও এর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। মহাত্মাজীর ইচ্ছা মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে যা কিছু জানা বা চর্চা দরকার তা শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ মূল হাতের কাজকেই অবলম্বন করে তৈরী হোক। আর গুরুদেবের ইচ্ছা হাতের কাজ শিক্ষার মূল ভিত্তি হলেও মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিষয়ের অনুকূল একটি আবহাওয়া তৈরী করতে হবে বিদ্যালয়ে সকলে মিলে ধ্যানে, কর্মে, চিন্তায়, বাক্যে ও প্রকৃতির অনুকূল সাহচর্যে।

মহাত্মাজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার জন্মকাল থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সেই থেকে এই শিক্ষানীতির যাঁরা হাল ধরে আছেন, তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম ও শ্রীযুক্তা আশা দেবী। এঁরা উভয়েই একটানা বহু বৎসর শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রে পরিচালনের দায়িত্বে কাজ করেছিলেন। এই সূত্রে গুরুদেবের শিক্ষানীতি কর্মপদ্ধতির সঙ্গে এঁদের উভয়েরই একটা নিবিড় সম্বন্ধ ঘটেছিল। এখান থেকে তাঁরা উভয়ে প্রথম গেলেন ওয়ার্ধা শহরে, মহাত্মাজীর অনুরাগী ধনী শিষ্য যমুনালাল বাজাজের আহ্বানে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত নব-ভারত বিদ্যালয়ের পরিচালকরূপে। তাঁদের উপর পড়েছিল এটিকে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলার ভার। ১৯৩৫ সালে মহাত্মাজী সেবাগ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেই খানেই বাস করতে লাগলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার এক প্রস্তাব হরিজন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই সময় শিক্ষাবিষয়ে আলোচনা কালে যাঁরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম্ ও শ্রীযুক্তা আশা দেবী ছিলেন প্রধান। তাঁদেরই উৎসাহে ও আগ্রহে ঐ বৎসরই বুনিয়াদী শিক্ষা-বিষয়ে ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা হল, মহাত্মাজী হলেন সভাপতি। তাঁর শিক্ষানীতির প্রস্তাব সেইখানে তিনি পেশ করলেন। ডাঃ জাকির হোসেনকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত আর্য-নায়কম্‌কে আহ্বায়করূপে ৯ জনের একটি সমিতি খাড়া করে, বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির একটি বুনিয়াদ রচিত হল। এই সমিতির সুবিধার জন্যে, বুনিয়াদী শিক্ষানীতি অনুসারে সিলেবাস রচনায় যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের আচার্য নন্দলাল বসু রচনা করেছেন চিত্রকলার সিলেবাস্ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ রচনা করেন কাঠের কাজের সিলেবাস্। লক্ষ্মীশ্বরবাবু প্রারম্ভে ছিলেন শ্রীনিকেতনের ছাত্র। শিক্ষা শেষ করে যান উত্তর ইয়োরোপের কয়েকটি ছোট ছোট দেশে। কারিগরি শিক্ষায় বিখ্যাত "স্লয়েড"

পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফিরে এসে শ্রীনিকেতনেই শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে তিনি সেবাগ্রামের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং কাঠের কাজকে ভিত্তি করে সাধারণ অন্যান্য জ্ঞানের সমন্বয় কি করে হতে পারে সেই পদ্ধতিটি কার্যকরীভাবে সেখানে স্থাপনা করেছিলেন। এ ছাড়া শ্রীযুক্তা আশা দেবী ও শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম ত প্রথম থেকেই নিয়েছিলেন এই বিদ্যালয়টির সম্পূর্ণ দায়িত্ব এবং আদর্শ অনুযায়ী রূপ দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

এইসব তথ্যের পর নিশ্চয়ই করে বলা চলে যে, শিক্ষাবিষয়ে শিক্ষাসত্রের শিক্ষাদর্শ বুনিয়াদী পরিকল্পনা রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। মহাত্মাজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত টলস্টয় আশ্রমের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গুরুদেবের শিক্ষাদর্শ মিশেই যে বুনিয়াদী পরিকল্পনার সূত্রপাত একথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক।

গুরুদেবের শিক্ষাসত্রের আদর্শ দেশব্যাপী সাড়া জাগায় নি একথা ঠিক। আর তিনি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই শ্রীনিকেতনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার বার বলেছেন—

"সমগ্র প্রদেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই।……আমি কেবল জয় করব একটি দুটি গ্রাম। আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেইখানেই সমগ্র ভারতের একটি আদর্শ তৈরী হবে।…এই ক-খানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে—আমি বলবো এই ক-খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা' হ'লেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।"

বড় আদর্শকে রূপ দেওয়া বা জীবনে সফল করে তোলা মোটেই সহজ কাজ নয়। বহুদিনের সাধনা ও ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকতে হয়। কত রকমের বাধা বিপত্তি এসে ক্রমাগত মানুষকে আদর্শচ্যুত করে বিপথে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পথ ঠিক রেখে এগিয়ে চলাই

হল মানুষের সাধনা। সেই সাধনা না থাকাই হল মানুষের পক্ষে মৃত্যুর সমান। একথা খুবই সত্য যে, যে-কোন বড় আদর্শ মানবসমাজে যুগযুগান্তর ধরে সফল করবার চেষ্টা করে আজও মানুষ তার শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। নানা ধর্মমত মানুষের মধ্যে যুগে যুগে জেগেছে। সকলেরই মূল কথা হল ভালবাসা ও সেবা। অথচ সব ধর্মের অনুরাগীদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ, এখন পর্যন্ত কি রকম প্রবল।

নানারূপ বিরুদ্ধতা, অশ্রদ্ধা ও অলসতা গুরুদেবের আদর্শকে শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে দেয় নি একথা ঠিক, কিন্তু সে আদর্শ চ্যুত হয়ে বিপথে যে যায় নি একথা মানতেই হবে। আদর্শানুসারে শিক্ষাসত্র প্রাণপণ কাজ করে যাচ্ছে সেই একটি ছোট কেন্দ্রে। বুনিয়াদী শিক্ষা দেশে ব্যাপক সমর্থন পাওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু হুবহু আদর্শানুযায়ী বিদ্যালয়গুলিকে রূপ দেওয়া আজ পর্যন্ত কোথাও সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেও আদর্শানুযায়ী প্রাণপণে কাজ করে চলেছে, পথ ভ্রষ্ট হয় নি। তা সত্ত্বেও দশ বৎসর কাজের পর মহাত্মাজীর মনে হয়েছিল যে কর্মীরা ঠিক পথে কাজ করতে পারছেন না, তাই প্রকাশ্যে তাদের ডেকে বলেছেন—

"Either this method of education would serve by its own efficiency or die out because its inefficiency."

গ্রামীণ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা

'লোক সংস্কৃতি' কথাটির ব্যবহার ইংরেজ শাসনের আগে আমাদের ছিল বলে জানা যায় না। এই কথাটি আমরা পেয়েছি ইংরেজদের কাছ থেকে, তাদের 'Folk culture' কথাটির অনুবাদ হিসেবে। কথাটা তাদের মধ্যে এল কি করে তার একটু আলোচনা করা দরকার।

ইয়োরোপে যখন যন্ত্রযুগের সূত্রপাত হয়, তখন সেই সব শিল্প-কেন্দ্রকে নির্ভর করে সেখানে উদ্ভব হয় একটি বিশেষ সভ্যতা বা সংস্কৃতির। তখন থেকেই দেখা দেয় ইউরোপের সাহিত্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে একটি নূতন চিন্তাধারা। গ্রামকেন্দ্রিক পুরাতন চিন্তাধারা পরে আলাদা হয়ে এবং যন্ত্রযুগের নগর সভ্যতার চাপে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এইভাবে চলার দ্বারা গ্রামের মানুষের সহজ মনের স্বতঃউৎসারিত নানারূপ শিল্পবোধের উৎসটি বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত গ্রামের শিল্প, সাহিত্য ও সংগীত ঐতিহাসিক সংগ্রহের ও আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়।

গ্রামসংস্কৃতির এই দুরবস্থার প্রতি ইয়োরোপের ন[illegible] প্রথম দৃষ্টি পড়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তখন থেকেই শুরু হয় গ্রামের গান, কাব্য ও সাহিত্য সংগ্রহ এবং তার আলোচনার প্রতি ঝোঁক। সে আন্দোলন আরো ব্যাপকতা লাভ করে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। এই সময়ে ইয়োরোপের সাহিত্যে, সংগীতে ও চিত্রে রোমান্টিক আন্দোলনকে ঘিরে নতুন এক [illegible]তাবোধের আবির্ভাব হয়। এই আন্দোলনের অঙ্গরূপে নিজ দেশের প্রাচীন গ্রাম-সংস্কৃতির প্রতি অনেক শিল্পীই আকৃষ্ট হন। এর দ্বারা তাঁরা প্রাচীন প্রথাকে ঠিক ফিরিয়ে আনতে চাননি। তাঁরা বেশ জানতেন যে, তা কোন দিনই সম্ভব নয়। তাঁরা কেবল চেয়েছিলেন দেশের প্রাচীন সংগীত, সাহিত্য শিল্পধারার পরিচয়টিকে জানতে ও তার সাহায্যে বিশেষ কাল ও দেশের মানুষের বা তার সমাজের প্রকৃতিটিকে বুঝতে। আর চেয়েছিলেন সৃষ্টির কাজে গ্রামের প্রাচীন সম্পদের কাছ থেকে প্রেরণার সন্ধান পেতে। এই কারণে সে দেশে সংগীত ও সাহিত্যের সংগ্রহ-আন্দোলন এক সময়ে এমন ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে, ইয়োরোপের অনেক দেশে পরে সংগ্রহযোগ্য আর কিছুই রইল না। সেই কারণে উনবিংশ শতকের মাঝে গ্রামের প্রাচীনধারার গানের নাম দেওয়া হল 'Folk Song' আর শহরের

শিক্ষিতদের গানকে বলা হল 'Art Song'। 'Flok Lore' কথাটিও সৃষ্টি হল ঐ সময়ে।

ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সে রকমের কোন যন্ত্রযুগের সূত্রপাত ঘটেনি বটে, কিন্তু উনবিংশতকে কলিকাতার মত নগরকে ঘিরে এমন একটি মিশ্র ও দুর্বল সভ্যতার প্রকাশ দেখা গেল যে, তার ফলে ধীরে ধীরে নগরবাসী গ্রামবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

ইংরেজরা ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার নানা বিস্ময় নিয়ে যখন ভারতবর্ষে এল, তখন তারা নতুন শহর বা পুরাতন নগরগুলিকেই তাদের আশ্রয়রূপে ঠিক করে নেয়। এই সুযোগ সুবিধা ও নূতনত্বের আকর্ষণে গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা দলে দলে ছুটে চলল শহরের দিকে, গ্রামে আর থাকতে চাইল না। সেখানে পড়ে রইল তারা, যাদের যাবার উপায় ছিল না কোথাও। আগের দিনে রাজারা, ধনীরা গ্রামকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন বলে তাঁদের ধনসম্পদের প্রায় সবটাই ছড়িয়ে পড়ত সেইখানেই। ইংরেজদের আমলের শহরগুলি সেদিক থেকে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তাই গ্রামে গিয়ে টাকা খরচ করতে কেউ আর চাইল না। মানুষের সঙ্গে টাকা পয়সার সুখ সুবিধাগুলি সবই শহরে এসে জমা হতে লাগল। শহরগুলি গড়ে উঠ্‌তে লাগল বিপুল ঐশ্বর্য ও চাকচিক্য নিয়ে। দেখা দিল ইয়োরোপের সংমিশ্রণে নতুন এক সভ্যতার উৎপত্তি। বিদেশীর আচার ব্যবহার সাজপোশাকে অভ্যস্ত আমাদের অবস্থাটা হল কাক ও ময়ূরের গল্পের মত। ময়ূরের পুচ্ছ পিছনে লাগিয়ে কাকের মনে যে গর্ব জেগেছিল, শহরবাসী আমাদেরও বুক সেই রকমের এক গর্বে ফুলে উঠল। স্বাধীনতা লাভের পরেও আমাদের মনের সেই ভাব আজও যে খুব গেছে তা মনে হয় না।

সজীব প্রাণের প্রকাশ ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি গ্রামগুলিকে এইভাবে উপেক্ষা করার দরুণ ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে গিয়ে লাগে এক

দারুণ আঘাত। এ যুগের শহর-কেন্দ্রিক সভ্যতার বাণী পৌঁছল না গ্রামগুলিতে। তাই গ্রামের সঙ্গে নতুন যুগের ভাবধারার কোন সমন্বয়ও আর ঘটল না। অথচ, এদিকে [illegible] এতদিনকার প্রাণবাণ সাংস্কৃতিক প্রবাহটি হারিয়ে গ্রামগুলি হয়ে পড়ল দরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন, নিরানন্দময় ও প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে উদ্যমহীন জীর্ণশীর্ণ। একে একে ধ্বংস হল জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র, কর্মপ্রচেষ্টা ও স্বতঃ উৎসারিত আনন্দের প্রাণবাণ উপলক্ষ্যগুলি। দেখা দিল আত্ম-অবিশ্বাস।

গত একশ বছরের মধ্যে শিক্ষায়, জ্ঞানে, ধনে, প্রতিষ্ঠাবান গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে গেছেন কলিকাতায় বা অন্যান্য শহরে। সেই সব শহরে বসে হয়তো তাঁরা জিলা সাহিত্য সম্মিলন বা সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ছেন, কিন্তু নিজেদের জেলায় কিংবা গ্রামে সে রকমের প্রতিষ্ঠান গড়বার উৎসাহ বা সময় তাঁদের মধ্যে কজনের ছিল বা এখনও আছে!

যান্ত্রিক সভ্যতার উৎসস্থল ইয়োরোপের গ্রামের কিন্তু এ অধঃপতন ঘটেনি। তার কারণ সেদেশে যন্ত্রযুগের নব নব বিকাশের সঙ্গে গ্রাম ও শহর পরস্পরে যোগ রক্ষা করে চলতে পেরেছে। এযুগে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে গ্রামের সঙ্গে শহরের এইরূপ একটি ভাল যোগাযোগের নমুনা দেখি জাপানে। ইংরেজদের রাজত্বকালে নগরবাসী ভারতীয়েরা পাশ্চাত্ত্যের সংমিশ্রণে যে এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করল, তা কেবল শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না। গ্রামের সঙ্গে কি করে তাকে যুক্ত করা যায় সে রকমের কোন চেষ্টা বড় দেখা গেল না। উপেক্ষিত গ্রামগুলি ভিখারীর মত শহরের সভ্যতা তার উচ্ছিষ্ট থেকে ছিটেফোঁটা যা দিয়েছে তাই মাথায় করে নিয়ে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছে।

কিন্তু অনাহারে, অর্ধাহারে, দারিদ্র্যে, রোগে, অশিক্ষায় গ্রামবাসীর এত দুর্গতি সত্ত্বেও আজও দেখি তাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকবার জন্যে সাধ্যমত কর্মশক্তির ব্যবহার, আর দেখি প্রাণের

আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে গ্রামসমাজের কতরকমের পূজা-পার্বণ ও উৎসবের আমোদ-আহ্লাদ। তাকে জড়িয়ে আছে কতরকমের গান বাজনা, কতরকমের নাচ, কতরকমের অভিনয় ও কতরকমের সহজ শিক্ষাকলা। কিন্তু ভারতের শহর-কেন্দ্রিক নতুন সভ্যতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে এখনো এগুলি শহরের শিক্ষিতদের কাছে অবজ্ঞাত, অনাদৃত।

তাই বলে যে, ভারতের সব গ্রামই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী একথা বলা চলেনা। যেমন বাংলার প্রত্যেক গ্রামে যাত্রার দল নেই, কথক নেই, ঢুলি নেই, কবির দল নেই, বাউল নেই, নাচের দল নেই। বহু গ্রামকে টাকা খরচ করে এদের আনতে হয় অন্যখান থেকে। যাত্রার সাজসজ্জার জন্যে তাদের শহরে লোক পাঠাতে হয় টাকা পয়সা দিয়ে। নিজেদের জিনিস নিজেরা তৈরি করে নিতে অসমর্থ। গ্রামের উৎসবে উৎসব প্রাঙ্গণ কি করে সাজাতে হয় তা পর্যন্ত বহু গ্রাম ভুলে গেছে। দেয়ালে ছবি বা নক্সা আঁকার চলন প্রায় উঠেই যাচ্ছে। যারা পট আঁকতো মাটির সরাতে বা লম্বা কাগজের মোড়কে ছবি এঁকে গল্প শুনিয়ে বেড়াতো, তারা আজকাল প্রায় আঁকেই না। তাছাড়া তাদের ছবির ভালমন্দ বোধ আগে যেরকম উন্নত ছিল, আজকাল তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রামে আজকাল আলপনার চলন খুবই কমে এসেছে, যাও আছে তাতে আগের মত বৈচিত্র্য নেই। পূর্বে নানা পূজা উপলক্ষে মূর্তিগড়া থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই করতে হত গ্রামের শিল্পীদের। আজকাল প্রত্যেক গ্রামে সেই রকম শিল্পী পাওয়া দুষ্কর। দশখানা গ্রাম একত্র করে তবে একজন হয়তো শিল্পী পাওয়া যাবে।

ইংরেজীসভ্যতার আবহাওয়া গ্রামের আত্মনির্ভরতার প্রতি যে অবিশ্বাস এনে দিয়েছিল, গ্রামের আজ যে দুর্গতি দেখছি সেটিই হল তার মূল কারণ। গ্রামের মধ্যে আত্মনির্ভরতার সেই সাহস আবার জাগাতে পারলে তবেই গ্রাম বাঁচবে, দেশও বাঁচবে। পূর্বের

স্যায় গ্রামে আনন্দের আয়োজন করতে হবে নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টায় ও সম্পূর্ণ নিজের উপর বিশ্বাস রেখে। বাইরের সাহায্যের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করলে নিজেদের সামর্থ্যের প্রতি যে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে তা দূর করা কঠিন হবে।

কেউ হয়তো মনে ভাবছেন যে, বাইরে থেকে ধনী ও দেশের সরকারের সম্পূর্ণ সহায়তা ছাড়া আত্মনির্ভরতার এই সব কথার কোন মূল্য নেই। নিজে আমি তা বিশ্বাস করিনা। আজও আমরা ভারতবর্ষের শত শত গ্রামে যে বহু বিচিত্র পদ্ধতির নাচ, গান ও অভিনয় দেখি, এর জন্যে কি গ্রামবাসীরা শহরের ধনী বা দেশের সরকারের কাছে কোনদিন সাহায্য চেয়েছিল? না সাহায্য কেউ করেছিল? তা কোন দিনই কেউ করেনি।

গ্রামের ছেলেদের দ্বারা অভিনীত যাত্রা দেখেছি, গ্রামের কবির কবিগান শুনেছি, ভাদু গান শুনেছি, বাউলের গানও শুনেছি। প্রত্যেক বারই আশ্চর্য হয়েছি তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে। এমনও কবি আছেন যাঁরা এযুগের প্রচলিত শিক্ষার ধার দিয়েও যাননি, অথচ তাঁদের কবিগানে যে উপস্থিত বুদ্ধির প্রকাশ দেখি তার তুলনা খুবই কম। তাঁরা একাধারে সুরে ও ছন্দে গান করে যেভাবে সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলে, উত্তর প্রত্যুত্তর দেয়, এ ক্ষমতার বিশেষ মূল্য আছে। এ শহরবাসী কোন কবির পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রামের ঢুলিরা ঢোলের বাজনায় যে অপূর্ব কৌশলের অধিকারী, তা বোঝবার ক্ষমতা কি শিক্ষিতদের আছে? বাউল একহাতে একতারা, একহাতে বাঁয়া, পায়ে নুপুর বেঁধে গানের সঙ্গে নাচবার যে ক্ষমতা রাখে সে কোন দেশের শহরবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা জানিনা। শহরের ধনীরা বা ইংরেজ আমলের সরকার গ্রামের এই সব শিল্পীদের কোনদিনই কোনভাবে সাহায্য করেনি। তবুও গ্রামে ঐ সব শিল্পীরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি।

কেউ কেউ হয়তো মনে করবেন যে, এই উচ্চ প্রশংসার কথাগুলি আমি একটু বানিয়ে বললাম। কিন্তু তা নয়। এই অবজ্ঞাত পল্লী-

সংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরে আমাদের গুরুদেব একদিন কিভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা কারও অজানা নেই। বাংলার পল্লী-গানের মধ্যে বাউলদের ভাবধারা, তাদের গানের সুর ও ঢং গুরুদেবের সংগীত জীবনের একটি বিশেষ প্রেরণার উৎস হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চ ও নানা রঙের আলো ছাড়া, সামিয়ানার তলায় উঠানে যে প্রণালীতে আজ আমরা যাত্রা দেখি, তাকে গুরুদেব গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন, তাই বলেছেন, 'আমাদের দেশের যাত্রা আমার ওই জন্যে ভালো লাগে।' বিশ্বভারতীতে রঙ্গমঞ্চ ছাড়া নাটকের অভিনয়ের চলন হল এই কারণেই।

কিছুকাল থেকে শহরবাসীরা গ্রামের নানারূপ শিল্পকলা, সংগীত, নৃত্যের চর্চা ও তার সংগ্রহের দিকে অত্যধিক ঝুঁকেছে দেখতে পাই। বর্তমান শিক্ষিত শহরবাসীদের নাচের মূল ভিত্তি হল গ্রাম অঞ্চলের নানাপ্রকার নাচ ও নৃত্যাভিনয়। শহরের রঙ্গমঞ্চে গ্রামের অনুকরণে কত রকমেরই না নাচ দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে। নানাপ্রকার গ্রাম-প্রচলিত সুর ও গান আজ শহরবাসীদের বিলাসে পরিণত হয়েছে। এ সব দেখে শুনে অনায়াসে বলা চলে যে, মরণাপন্ন গ্রামের মধ্যে এখনো এমন কিছু আছে যা নিয়ে সে অনায়াসে গর্ব করতে পারে। শহরের শিক্ষিতরা নিজেদের বড় মনে করে এতদিন গ্রামের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইতো, আজ মাথা হেঁট করে আসতে হচ্ছে তাদেরই কাছে।

শহরবাসী অনেকেরই মধ্যে এখনো এই ধারণা বদ্ধমূল যে, নানাপ্রকার গান, নাচ, কলাবিদ্যা জীবনযাত্রার পথে শিক্ষা ও খাওয়া-পরার মত প্রয়োজনীয় স্থান গ্রহণ করতে পারে না। তাই লেখাপড়া ও খাওয়ার যতক্ষণ না একটা ভাল সুরাহা হচ্ছে ততক্ষণ নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদের চিন্তা মানুষের পক্ষে না করাই ভাল। কিন্তু একথা মেনে নেওয়া যায় না। অনাহারে, অর্ধাহারে, রোগে, অশিক্ষায় গ্রামবাসীদের যে কতরকমের দুর্গতি তা আজ কারু অজানা নেই। কিন্তু তাহলেও তাদের মধ্যে জ্ঞান

লাভের চেষ্টা, বেঁচে থাকবার জন্য কাজ করার উৎসাহ, আর গ্রামের দুঃখ কষ্টের আবহাওয়ার মধ্যে মনের আনন্দকে জিইয়ে রাখবার জন্যে নানাপ্রকার পূজা-পার্বণ ও উৎসব লেগেই আছে। পেটে ভাত নেই, তবুও উৎসব দিনে নাচ গানে বাজনায় সাধ্যমত মনের আনন্দটুকু তারা প্রকাশ করবেই। তা না করে তারা থাকতেই পারেনা। গ্রামে গ্রামে আজও যে গান বাজনা নাচ ইত্যাদি বেঁচে আছে তা তাদের মনেরই ঐ রকম একটি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায়। এই অতিবড় সত্যটিকে চোখে দেখেও অনেকে মানতে চায়না।

গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের উপায়

প্রশ্ন জাগে যে, এ যুগের গ্রামের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাকে বা তার আনন্দের জীবনটিকে আবার প্রাণবান করে তোলা যায় কি করে? এর উত্তরে বলব, দেশের যেখানে যেভাবেই যাঁরা গ্রামের শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের দ্বারাই একাজ সবচেয়ে সহজ হবে বলে মনে করি।

তাঁদের, গ্রামের কাজে হাত দিয়ে, প্রথমেই সেই অঞ্চলে বা জেলায় কতরকমের উৎসব, কতরকমের গান, কতরকমের নাচ, কতরকমের খেলাধুলা, পূজা অভিনয় আছে তার সম্পূর্ণ তালিকা করে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে যোগাড় করতে হবে ভাল ভাল গাইয়ে, গীতকার, নর্তক, অভিনেতা ও শিল্পীদের বিস্তারিত নাম ধাম পরিচয়। সেই অঞ্চলে কতরকমের বাজনা ও তার ভাল বাজিয়ে আছে তারও বিস্তারিত পরিচয় সংগ্রহ করতে হবে।

প্রথমেই গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করে সেটিকে বিদ্যার্থীদের বা [illegible]দের জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে। পূর্বেই বলেছি প্রাচীন যুগের তপোবন, হিন্দুমন্দির বা

গোষ্ঠী-ই ছিল ভারতীয় সমাজের জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের বিকাশের মূল উৎস। এ যুগে সেই পুরানো সমাজ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব নয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের সেই আদর্শ এ যুগেও হয়তো বিকাশ লাভ করতে পারে এই সব বিদ্যালয়কে অবলম্বন করে। আসলে এ যুগের বিদ্যালয়গুলিকেই সেই দায়িত্ব নিতে হবে। তাই অনেকে বিদ্যালয়কে বলতে চান "বিদ্যামন্দির"।

গ্রামের বিদ্যালয়কে করতে হবে গ্রামের আনন্দ উৎসবের কেন্দ্র। বিদ্যালয়কে ঘিরেই গ্রামের আনন্দের জীবনের সব কিছুকে ধীরে ধীরে গড়ে নিতে হবে। গ্রামটি যেন বিদ্যালয়কে অবলম্বন করে আনন্দের জীবনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেখানে তৈরি করে নিতে হবে গানের দল, বাজনার দল, অভিনয়ের দল ও নৃত্যের দল। অর্থাৎ বাইরে থেকে বায়না দিয়ে কাউকে যাতে না আনতে হয়, সেই চেষ্টাই করতে হবে।

আমাদের দেশের উৎসবগুলি প্রায় সবই কোন-না-কোন দেবদেবী বা ধর্মের সঙ্গে জড়িত। ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন উৎসব ভারতে খুব কমই দেখা যায়—বিশেষতঃ প্রাচীন উৎসবগুলির মধ্যে। এই কারণে এক ধর্মের উৎসবে অন্য ধর্ম সম্প্রদায় নিজেকে সম্পূর্ণ জড়াতে পারেনা, কুণ্ঠা বোধ করে। যে গ্রামে একাধিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের বাস সেখানে বিদ্যালয়ে কোন এক সম্প্রদায়ের উৎসবকে বিনা বিচারে চালু করা ঠিক হবে না। সেক্ষেত্রে সেই সব উৎসবকে বিদ্যালয়ে একটু নতুন সাজেই সাজাতে হবে। কিভাবে তা করা সম্ভব তার কয়েকটি উদাহরণ দিই। যেমন হিন্দুদের জন্মাষ্টমী বা রথযাত্রার দিনটিকে অনায়াসেই বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ বা হলকর্ষণ উৎসব বলে ধরা যেতে পারে। বিশ্বকর্মা পূজার দিনকে করা যেতে পারে গ্রামের নানা প্রকার কুটির শিল্পের প্রদর্শনী দিবস। সেখানে তার শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হবে। দশহরা বা বিজয়া দশমীর দিনে হবে গ্রামের যুব সমাজের খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক সম্মেলন। লক্ষ্মীপূজার

রাত্রিটি হবে পূর্ণিমার উৎসব বা শারদোৎসব—নবান্ন, ধানকাটা বা নতুন ধানের উৎসব। পৌষপার্বণ—বনভোজনের উৎসব। বনভোজনে নানাপ্রকার খেলাধূলা গানবাজনা থাকবে কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে। কালীপূজা বা দেয়ালী উৎসব নানা প্রদেশের নব বৎসরের উৎসব। বাংলায় তা নয়। কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাত্রে আলো জ্বালানো, সবই হতে পারে। দোলকে বসন্ত উৎসবে পরিণত করতে হবে। যে ভাবে শান্তিনিকেতনে গুরুদেব দোল উৎসবের চলন করলেন। সরস্বতী পূজার দিনকে গ্রামের খেলাধুলা (sport), প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর দিনে পরিণত করতে হবে। সন্ধ্যায় হবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এইসব উৎসবগুলি যে সকল দেব, দেবী বা ধর্মপ্রবর্তকের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের নিয়ে আলোচনা হবে ঐ দিনের সভায়। কিন্তু কতগুলি বিশেষ রকমের পালনীয় প্রথা, এর সঙ্গে যা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে তাকে বর্জন করতে হবে।

দেশের স্মরণীয় মহাপুরুষদের জন্মদিন, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিনটিকেও উৎসব দিনে পরিণত করতে হবে। প্রত্যেক উৎসব দিনে সকালে এবং রাত্রে বৈতালিক হবে, তা ছাড়া সাহিত্য, গান, বাজনা, অভিনয় ইত্যাদির আসর বসবে নিয়মিত। এই সব সভা বা সম্মেলনই হবে প্রধানতঃ গ্রামের চিত্ত বিকাশের উপায়। এই সম্মেলনের বা উৎসবের দিনের জন্যেই অভিনেতা, গায়ক ও নাচিয়ে তৈরি হবে। গ্রামের কবি সেখানে তার কবিতা শোনাবার সুযোগ পাবে। উৎসব দিনকে সাজাবার জন্যে শিল্পী তৈরি করতে হবে গ্রামেই।

ধর্ম-প্রবর্তক, দেশনেতা এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের স্মরণ-দিনে যে সভা বসবে গ্রামে, তাতে এ যুগের শহরের বক্তাদের মত কেবল বক্তৃতার দ্বারা তাঁদের জীবনী আলোচনা না করে গ্রামে প্রচলিত কথকতা বা কবিয়ালদের মত গানের সুরে ও ছন্দে পর্যালোচনা পদ্ধতিতে

জীবনী আলোচনা করার প্রথার পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। তাতে গ্রামের মৃতপ্রায় একটি উৎকৃষ্ট কলা পুনর্জীবন পাবে। এই পদ্ধতি অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা উচিত।

অভিনয় কালে গ্রামে প্রচলিত যাত্রার প্রথাই গ্রহণযোগ্য। শহরের মত রঙ্গমঞ্চের অভাবে নাটকের অভিনয় কখনো বন্ধ রাখা উচিত নয়। অথবা কোন রকমে একটা রঙ্গমঞ্চের মত কিছু একটা খাড়া করে তাতে অভিনয় করা ঠিক নয়। শহরে রঙ্গমঞ্চের ব্যবহারের দ্বারা নাটকের অভিনয়ের সময় স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জা, তার পরিবর্তন, ও আলোক সম্পাতের বৈচিত্র্য ঘটান সহজ হয়। তাতে দর্শক মুগ্ধ হয়। গ্রামে সাফল্যের সঙ্গে যদি তা করা সম্ভব হয় তবে রঙ্গমঞ্চে আপত্তি নেই। শহরে হয় বলেই গ্রামে কোন রকমে মঞ্চ বানিয়ে অভিনয় করতে হবে অথচ তার ভাল দিকটা গ্রহণ করতে পারছি না, এই অবস্থায় গ্রামে তা বর্জন করাই উচিত। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উঁচু ও প্রশস্ত বেদীতে সব রকমের নাটকের অভিনয়, গানের বা নৃত্যের আসর বসবে। কেবল যাত্রার মত অভিনেতাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের একটু পথ করে দিতে হবে। শ্রোতারা বসবে বেদীর নীচে তিনদিকে।

উৎসব দিনে যখনি সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের প্রদর্শনী বসবে, তখন গ্রামাঞ্চলে আজও প্রচলিত শিল্পের শিল্পীরা যাতে তাঁদের ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ পায় তার প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে। ঐ দিনে পল্লী-সঙ্গীতের গাইয়ে, বাজিয়ে ও নাচিয়েদের বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করতে হবে। যেমন বীরভূমে আছে কবিগান, ভাদুগান, মনসামঙ্গল গান, সত্যপীরের গান, সাপুড়েদের গান, বাউল-বৈরাগীদের গান, কীর্তন গান, কথকদের গান, লুটোগান ও সাঁওতাল সমাজের গান ইত্যাদি। এরা যে পল্লী-সংস্কৃতির ধারক সেই সম্মান তাদের এইভাবেই দিতে হবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গীত-শিক্ষায় এই সব গানেরও বিশেষ স্থান হওয়া চাই। তাতে এই সব প্রাচীন ধারার প্রবাহ থাকবে বেঁচে।

গ্রামে যে সব বাদ্যযন্ত্র আজও প্রচলিত আছে, সেগুলিকে বিদ্যালয়ের সঙ্গীতের চর্চায় একমাত্র সঙ্গতরূপে গ্রহণ করতে হবে। যেমন ঢাক, ঢোল, খোল, মাদল, নাকাড়া, গাবগুবাগুব, খঞ্জনী, কাঁসি, মন্দিরা ইত্যাদি নানাপ্রকার বাজনা। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এগুলোও শেখবার ব্যবস্থা করতে হবে। সুরের জন্যে একতারা, দোতারা, বাঁশী, বৈরাগীদের সারিন্দা যন্ত্র গ্রামের বা বিদ্যালয়ের সঙ্গীতে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। হারমোনিয়ম, তানপুরা, এস্রাজ, বেহালা, গিটার জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দরকার নেই, কিন্তু এই সব দামী ও সাধনা-সাপেক্ষ যন্ত্রের চাপে যদি গ্রামে প্রচলিত তারের যন্ত্রের ব্যবহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তবে তা দোষ বলে গণ্য হবে।

অনেক সময় দেখা গেছে সাঁওতালদের গ্রামে যখন কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে শহরের শিক্ষিতেরা, তখন সাঁওতাল সমাজের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা যোগ দিলেও তাদের গান, তাদের নাচ, তাদের ভাষায় অভিনয়, বা তাদের ভাষায় আবৃত্তি তারা একেবারেই করেনি। করেছে কেবল বাংলাদেশের খ্যাতনামা কবিদের গান, কবিতা আবৃত্তি, তাঁদেরই লেখা নাটকের অভিনয়। সেখানে আলপনা দেওয়া হয়েছিল শহরের নতুন পদ্ধতিতে। সাঁওতালদের মধ্যে যে আলপনার ধারা রয়েছে তাও গ্রহণ করা হয়নি। এর দ্বারা তাদের নিজেদের ভাষাকে, গানকে, কলাকে তারা ছোট করে দেখ্‌তে শেখে। যত ছোটই হোক তারও যে মূল্য আছে এই বোধ যদি তাদের মধ্যে জাগানো যায় তবে গ্রাম উন্নয়ন কাজ যে সম্পূর্ণ সফল হলনা, একথা বলতেই হবে।

শহরের সঙ্গে যোগ না রেখে চলাও আজকাল সম্ভব নয়। তাই এই সব উৎসবের অনুষ্ঠানে শহরের কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক, বাজিয়েদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে আসতে হবে। তাঁরাও গ্রামের শিল্পীদের সঙ্গে একই আসরে বসে তাঁদের গান বাজনা নাচ অভিনয়

সব শোনাবেন দেখাবেন। এর দ্বারা গ্রামের সমাজের চিত্তবৃত্তির বিকাশ ঘটবে অথচ সে সমাজ নিজেকে ছোট করে দেখতে শিখবে না।

এই রকমের আসরেই তাদের কাছে উচ্চাঙ্গের হিন্দিগান, যন্ত্র সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অন্যান্য খ্যাতনামা বাঙ্গালীদের গান, কবিতা, নাটকের অভিনয় দেখাতে হবে, শোনাতে হবে। অর্থাৎ সব সময়েই পাশাপাশি উভয়কে রেখেই আসর বসানো দরকার। কেবল বাইরের থেকে একদল গিয়ে তাদের আনন্দ দেবে এ হতে পারে না। এতে করে এতদিন যা ঘটেছে তারই পুনরাবৃত্তিই ঘটবে অর্থাৎ গ্রামবাসীরা মনে করতে শিখবে যে তাদের গান অভিনয় ইত্যাদি শহরের বাবুদের শোনাবার মত নয়।

কোন একজাতের সঙ্গীতের প্রভাবে অন্যরকমের সঙ্গীত অবজ্ঞাত হওয়া ঠিক নয়। সব জাতের সঙ্গীতেরই নিজস্ব একটি বিশেষ রূপ ও রস আছে যা রসিক মাত্রেরই মন মুগ্ধ করে। তুলনা দেওয়া চলে ফুলের সঙ্গে। পৃথিবীতে ঘাসের ফুল, বনজঙ্গলের ফুল সবই ফোটে কিন্তু যারা সত্যিকার ফুলের রসিক তাদের কাছে ঘাসের ফুল থেকে গোলাপ বা পদ্মফুল পর্যন্ত সবেরই সমান আদর। সেই রকম গ্রামের নানা প্রকার দেশীগান, শহরের শিক্ষিতদের দ্বারা রচিত গান ও উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান, সবেরই সমান আদর হয় প্রকৃত সঙ্গীত-রসিকের কাছে। সে রকমের সুররসিক একজনকে দেখেছি, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

গ্রামের বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ বিশেষ উৎসবের উপলক্ষ্য ছাড়া বাইরের গান শেখানো ঠিক নয়। বাইরের গানকে বিদ্যালয়ের জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে হবে। এই উপায়ে তাদের নানা প্রকার গান শেখানো সহজ। কেবল গ্রামে কেন, আমার মনে হয় যে, কোন [illegible] শিক্ষায় এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে অধিক সুফল পাওয়া যাবে। কিভাবে বাইরের গান উৎসব উপলক্ষ্য করে শেখানো যেতে পারে তার কয়েকটি মাত্র নমুনা দেখাচ্ছি।

উল্লিখিত উৎসব দিনের জন্যে কতরকমের গান প্রয়োজন তা আগে ভেবে দেখা যাক।

১। উৎসব দিনের সকাল ও রাত্রের বৈতালিক গান।

২। নববর্ষের গান।

৩। বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণের গান।

৪। শরৎঋতুর গান, শারদোৎসবের গান, বিজয়ার গান।

৫। দেয়ালীর গান, কালীসাধনার গান।

৬। ধানকাটার গান, নতুন ধানের গান।

৭। বসন্তোৎসবের গান, হোলির গান।

৮। বর্ষশেষের গান।

৯। জন্মদিনের গান।

১০। নানা সম্প্রদায়ের দু একটি করে ধর্মসঙ্গীত।

১১। জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা উত্তোলন সঙ্গীত।

১২। বিদ্যালয়ে কাজ আরম্ভে সমবেত ভাবে প্রার্থনা গান।

১৩। শোক সভার উপযোগী গান।

১৪। নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গাওয়া চলবে অন্যভাবের ও রসের গান।

গ্রামে প্রচলিত গানে এত রকমের বিষয় বৈচিত্র্য পাওয়া যাবে না। তাই দরকার হবে সেই রকমের গান গ্রামের কবি ও সুরকার দের দিয়ে করিয়ে নেওয়ার। কিম্বা শহরের গীতিকারদের গানে যদি তা পাই সেখান থেকে তা সংগ্রহ করে নিতে হবে। যেমন বাংলা দেশে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত থেকে বিষয় বৈচিত্র্যের সেই সুবিধা আমরা পাচ্ছি। সেই সব গান আমরা গ্রামের উৎসবে [illegible] শেখাতে পারি। সংখ্যায় অনেক গান শিখে যখন ভাল করে তা গাইতে পারবে তখন সেই গান থেকে তার সুর ও রাগিনীর রহস্যটিকে তাদের কাছে খুলে ধরবার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ তাদের শেখা যে-গানে বেহাগ রাগিণী আছে তারই একটি "সারগম" বা লক্ষণগীত

তাদের প্রথম শিখিয়ে তার পরে একটি হিন্দি গান শেখাতে হবে সেই রাগিণীতে, বিস্তারিত তান আলাপ ও সুরবিস্তারের অলংকার বাদ দিয়ে। এই ভাবে হিন্দি সঙ্গীতের যে কটি রাগ রাগিণী শেখা গানের মধ্যে পাওয়া যাবে, তা শেখাতে হবে। এই পদ্ধতিতে গান শেখালে গ্রামবাসী ছেলেমেয়েদের কোন গানই শিখ্‌তে কষ্ট হবে না অথচ সঙ্গীতের জ্ঞান বিস্তার লাভ করবে। বাইরের গানের প্রতি মনে উৎসুক্য জাগবে। এই উৎসুক্য জাগাতে পারলেই গানের শিক্ষা সার্থক হল বলে সকলেই স্বীকার করবে। অন্যভাষার গানও এই পদ্ধতিতে কি করে সহজে শেখানো যায় তা দেখা যাক।

গুজরাতি, মারাঠি, আসামী বা দক্ষিণ ভারতের কোন একজন মহাপুরুষের স্মরণোৎসবের আয়োজন করা হলো। ছাত্র-ছাত্রীদের বলা হল যে, যাঁকে উদ্দেশ্য করে স্মরণসভা তাঁর ভাষায় রচিত গানই একটি সভায় গাইতে হবে। তখন দেখা যাবে সেই ভাষা না বুঝ্‌লেও সভায় গাওয়ার জন্যে প্রবল উৎসাহে তারা গান শিখ্‌ছে।

উপলক্ষ্য সৃষ্টির দ্বারা গান শেখানোয় যে রকম দ্রুত ফল পাওয়া যায় এরকম অন্য কোন উপায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। এই ভাবে শেখানোর সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যে উৎসাহের সঞ্চার করে সেটিই শেখানোর পথে বিশেষ সাহায্য করে। তখন কঠিন গানও অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হয়। তখন তাদের কাছে কোন রাগরাগিণী কঠিন মনে হয় না। কিন্তু দেখা গেছে যে, ঢিমালয়ের বা অধিক কারুকার্য পূর্ণ গানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ উৎসাহ পায় না। ছন্দ-প্রধান গানে তারা ক্লান্তি বোধ করে না। এই জন্যে বাইরের থেকে উৎসবের গান বাছবার সময় গানের ছন্দের দিকটাও বিবেচনা করতে হবে।

নাচের সাহায্যে গান শেখানোতেও ভাল ফল পাওয়া যায়। দেখা গেছে যে, দলবদ্ধ দেশী নাচের সঙ্গে জড়িত গানগুলি নাচের ছাত্র-ছাত্রীরা অতি সহজেই শিখে নেয়। কখন যে শিখে ফেলে তা তারা নিজেরাই অনেক সময় বুঝতে পারে না। নাচ

থামলে পরে বুঝতে পারে যে গানটি তাদের আয়ত্তে এসেছে। এই উপায়েও অনেক রকমের অজানা অপরিচিত গান গ্রামবাসী-দের সহজে শেখানো যায়।

ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে নানা প্রকার গ্রাম সমাজের কোন-না-কোন রকমের নাচ প্রচলিত আছে। সেই অঞ্চলের বিদ্যালয়ে সেগুলিকে অবশ্য শিক্ষণীয় রূপে গণ্য করতে হবে। তবেই ঐ নাচগুলি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তা নইলে নয়।

সব সমাজের পক্ষে দলবদ্ধ দেশী নাচই প্রশস্ত। এই ধরনের নাচকেই প্রথমে বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। যে সব প্রদেশে দলবদ্ধ নাচ আজও প্রচলিত সেখানের বিদ্যালয়ে তার শেখাবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু যেখানে তা নেই তাদের জন্য তাদেরই গানের সঙ্গে অন্য প্রদেশের দলবদ্ধ নাচ মিশিয়ে নিয়ে শেখাতে হবে।

দক্ষিণ ভারতে ও আসামে কয়েক প্রকার উচ্চাঙ্গের নাচ ও নৃত্যাভিনয় আজও গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। সেখানের গ্রামের বিদ্যালয়ে কিন্তু ঐ সব নাচ বা নৃত্যাভিনয় শেখানোর ব্যবস্থা নেই। কেবল স্থান পেয়েছে দক্ষিণ ভারতের কোন অঞ্চলের মেয়েদের বিদ্যালয়ে একপ্রকার সহজ দলবদ্ধ নাচ। কিন্তু সব বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রী সকলের জন্যেই সব রকমের নাচ ও নৃত্যাভিনয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তা না হলে দেখা গেছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়ে বংশের ছাত্র বা ছাত্রীরা নিজেদের পূর্বপুরুষের ধারাটিকে অবহেলা করছে। এখন-কার দক্ষিণ ভারত ও মণিপুরের বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষিত নর্তক-বংশের যুবকদের মধ্যে এ মনোভাব খুবই প্রবল।

উৎসবের সাজসজ্জার বিষয়ে কিছু বলবার আছে। প্রথমেই খোঁজ করতে হবে গ্রামাঞ্চলের পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে আল-পনার চলন আছে কিনা। তারা কত রকমের আলপনা আঁকে।

রঙীন ও নক্সাকাটা বস্ত্র, আসন, চাটাই ইত্যাদি তৈরি হয় কিনা এবং কিভাবে পুজোর বা উৎসব দিনে গ্রামবাসীরা নিজেদের বাড়ী-ঘর সাজায়। সেই সব জিনিসের সাহায্যে এবং সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে উৎসবকে সাজাতে হবে। তবে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে উন্নত ধরণের সাজসজ্জা রচনা করার সময় গ্রামে-পাওয়া উপকরণই যেন ব্যবহৃত হয়। নেহাত অসম্ভব হলে অন্য প্রদেশের গ্রামের সাহায্য নেওয়া চলবে। সেখানকার জিনিস ব্যবহারের সময় এই সব গ্রামবাসীদের বোঝাতে হবে যে, তাদেরই মত আর এক অঞ্চলের গ্রামবাসীদের হাতে তৈরি জিনিস এগুলো। এর দ্বারা গ্রামবাসীরা উৎসাহিত হবে এই ভেবে যে, চেষ্টা করলে তারাও হয়তো পারবে নিজেদের জন্যে ঐ রকম জিনিস তৈরি করতে। অনেক গ্রামে বছর ৫০।৬০ আগেও নানা প্রকার নক্সা-কাটা কাপড়, কাঁথা, চাটাই, আসন ইত্যাদি অথবা নানাপ্রকারের আলপনা আঁকার রীতি প্রচলিত ছিল, এখন তা নেই। কিন্তু সেই সব পুরনো জিনিসের নমুনা হয়তো এখনো অনেকের কাছে পাওয়া যাবে। খুঁজলে জানা যাবে প্রাচীনেরা অনেকে তা করতেও জানেন। তাঁদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে নিয়ে, সেই জিনিস গ্রামের বিদ্যালয়ে তৈরি করতে শেখাতে হবে এবং তার দ্বারাই গ্রামের উৎসবের নানা প্রকার সাজসজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকনৃত্য

আজ আমরা "লোকনৃত্য" বলতে যা বুঝি সে নাচ এযুগের নগরের সৃষ্ট নাচ নয়। তা হল ভারতের গ্রামে বহুদিনের প্রচলিত আর এক সমাজের নাচ। ইংরেজের আমলে বহুদিন পর্যন্ত নাগরিক শিক্ষিত শিক্ষায় আমরা গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচলিত নানা প্রকার

নৃত্যকলা, তা সে কথাকলি হোক আর মনিপুরীই হোক, চর্চার যোগ্য বলে মনে করিনি। শহরবাসী আমাদের এই মনোভাবের দরুণ এযুগের গ্রাম-সমাজও মনে করেছে যে, তারা যে সব নৃত্যের চর্চা করে তার কোন মূল্য নেই। কিন্তু এ মনোভাব ইংরেজ-পূর্ব আমলে ভারতে ছিলনা। ইংরেজ আমলের আগ পর্যন্ত গ্রামকে কেন্দ্র-করে ভারতীয় নানাপ্রকার নৃত্যের সামান্যতম বিকাশ থেকে উচ্চাঙ্গের বিকাশের যে ব্যাপক নমুনা আজও আমরা দেখি তাতে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু ইংরেজ আমলে যে সভ্যতার বিকাশ হল বড় বড় শহরকে কেন্দ্র করে, তাতে পূর্বের গ্রামজাত সভ্যতার মত কোন সমাজের জন্যে নৃত্যের কোন নতুন বিকাশ ঘটেনি বহুদিন পর্যন্ত। এ সভ্যতা গ্রামকে নতুন কিছুই দিতে পারেনি। কেবল নগর-সমাজের বিলাসের উপযোগী একপ্রকার পেশাদারী নৃত্যধারার প্রচলন করেছিল। তা হল ইংরেজ আমলের থিয়েটারের ও সেই আদর্শে গঠিত যাত্রার নাচ।

সম্প্রতি শহরকে কেন্দ্র করে নতুন যে এক নাচের আন্দোলন দেখা দিয়েছে তার বয়স প্রায় ৩০ বছরের মত। এই নৃত্য আন্দোলনের আদর্শ হচ্ছে ইয়োরোপের পেশাদারী ব্যালে নৃত্য। চেষ্টা চলছে ভারতীয় নানাপ্রকারের গ্রামজাত নৃত্যের আঙ্গিকে তাকে সাজাবার। এর মধ্যে সাধারণ সহজ নাচ থেকে শুরু করে গ্রামের উচ্চাঙ্গের নৃত্যাভিনয় পর্যন্ত সবই আছে।

লোকনৃত্য কথাটাও আমরা পেয়েছি ইংরেজী "Folk dance" শব্দটি থেকে। ইয়োরোপে ঐ শব্দটির যে কারণে উৎপত্তি হল আমাদের দেশে কিন্তু সে রকমের কোন কারণ গত ৩৫ বৎসরের আগে পর্যন্ত ঘটেনি। ইয়োরোপের মত তখন পর্যন্ত নগরজাত স্বতন্ত্র কোন প্রাণবান নৃত্যধারা দেশে দেখা দেয়নি। এই শব্দটির যখন প্রচলন হল আমাদের দেশে, তখন দেখা গেল শহরের "বাইজী", "খেমটা", বা সেই ঢঙে গঠিত থিয়েটারের নাচ ছাড়া

আর বাকি সব নাচই "লোকনৃত্য"। ৪০ বৎসর পূর্বেও আমরা "কথাকলি", "মনিপুরী" নাচকে লোকনৃত্য বলেই জানতাম। Classical নাচের মর্যাদা এরা পেল গত ৩০ বছরের মধ্যে।

আমার কাছে ভারতের গ্রামজাত সব নাচই হল লোকনৃত্য, আর এই লোকনৃত্যকে আমি ছুই ভাগে ভাগ করি। তার প্রথমটির উদ্দেশ্য হল কেবল গ্রাম সমাজের চিত্তবিনোদন ও গ্রামে লোকশিক্ষার প্রচার করা। তার জন্যে স্বতন্ত্র একদল লোক তৈরি হয়েছে গ্রামে গ্রামে, যুগে যুগে। সেই ধারারই উন্নততর সংস্করণ হল, আজকাল যাকে আমরা Classical নাচ বলি, তাই। নানা প্রকার প্রাচীন ধারার নৃত্যাভিনয়গুলি হল এই প্রথম ধারার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্রাম সমাজের সকলের জন্যে যে নাচ সেই নাচ হল দ্বিতীয় দলের। সমাজের সকলেই যাতে এর আনন্দ নিজে নেচে অনুভব করতে পারে এর আসল উদ্দেশ্য এই। এ নাচ অন্যের চিত্ত বিনোদনের জন্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলে নিজের চিত্তবিনোদনের জন্যে। এ নাচ বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখবার নয়, এ নাচে নিজে যোগ দেবার জন্যে।

ভারতে এখনো গ্রাম সমাজে এই দ্বিতীয় দলের লোকনৃত্যই সংখ্যায় অধিক প্রচলিত এবং সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে পৃথিবীর আর কোন দেশ এর সমকক্ষ নয়। গ্রাম সমাজের দলবদ্ধ নাচগুলি হল এই দ্বিতীয় দলের।

মানুষ চায় জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে, নানা বিপরীত মনোভাব, আচরণ, কথাবার্তাকে একটি ছন্দোময় সুষমায় গেঁথে। তেমনি মানুষের সমষ্টি যে সমাজ, সেও চায় নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে, সমাজের ভিন্নপথগামী বিচিত্র মনকে ছন্দোময় শৃঙ্খলায় এনে। দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্য গীত হল সেই উদ্দেশ্য সাধনের একটি প্রধান উপায়। এই জন্যেই দলবদ্ধ নাচের এত প্রচার মানুষের সমাজে। এর মধ্যে অনেকে মিলে এক নিয়মে, ছন্দে ছন্দে

পা ফেলে, হাত নেড়ে, দেহভঙ্গির নাচ যেমন আছে, আবার তেমনি আছে ছন্দ থাকলেও সকলের একনিয়মে একসঙ্গে পা, হাত, দেহভঙ্গি না করার নাচ।

আমাদের দেশে দলবদ্ধ নাচের মধ্যে মেয়ে এবং পুরুষের পৃথক্ নাচই অধিক প্রচলিত। উভয়ের একত্র নাচ সে তুলনায় খুবই কম।

ইয়োরোপের শহরের সমাজের দলবদ্ধ নাচ হল "বল" নাচ। এতে প্রায় দেখা যায় মেয়ে ও পুরুষ হাত ধরে, কোমর ধরে নাচে এক সঙ্গে। তা দেখে মনে হবে যে সে দেশের পুরুষ ও নারীর সহজ মিলনের বাধা দূর করাই এর আসল উদ্দেশ্য, আর প্রেমের অভিনয়ই এই সব নাচে অধিক প্রচলিত। ইয়োরোপের গ্রামে দলবদ্ধ সামাজিক নাচের অধিকাংশই ঐ আদর্শে গঠিত।

ভারতের কোন কোন পল্লী অঞ্চলে মেয়ে পুরুষে দল বেঁধে পরস্পর হাত ধরে নাচে, তা দেখেছি। কিন্তু তা হলেও ইয়োরোপের "বল" নাচ বা সে দেশের গ্রামের অন্যান্য নাচের মত প্রেমের অভিনয় তাতে নেই। হয়তো অনেকে মনে করবেন যে, ভারতে নারী স্বাধীনতার অভাব হেতুই এ ভাবটি নৃত্যে অচল বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু ভারতের যে সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতা অত্যধিক, সেই পর্বত অঞ্চলবাসী সমাজের মধ্যেও দলবদ্ধ নাচে প্রেমের অভিনয় বিরল। সেখানেও একসঙ্গে নাচের ভিতর দিয়ে যে রস প্রকাশ পায় তা ভারতীয় নারী-সুলভ একটি শান্তরস কিন্তু নৃত্য-ছন্দের দোলায় তা প্রাণবন্ত।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে প্রাচীন ভারতে প্রেমের অভিনয়ে যুক্ত দলবদ্ধ নাচ ছিল বলেইত শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র গোপীদের সঙ্গে রাসনৃত্যের বর্ণনা পাই। কিন্তু একটা মনে রাখতে হবে যে, শ্রীমদ্ভাগবত বলেছে যে, এই নাচ হয়েছিল সমাজের চোখের আড়ালে লুকিয়ে। অর্থাৎ সে নাচ হলো সমাজের নিয়ম-ভাঙ্গা গোপন মিলনের নাচ। সেই জন্যে এই ধরনের নাচ থাকলেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজে তা প্রচলিত ছিল বলে মনে করি না।

ভারতের গ্রামে প্রচলিত কত রকমের দলবদ্ধ নৃত্য আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েছে তার তালিকা দেবার চেষ্টা করছি।

১। খালি হাতের নানা ভঙ্গীর দ্বারা নাচ।

২। পরস্পর হাত ধরে বা কোমর ধরে নাচ।

৩। তলোয়ার বা ঐ প্রকার অস্ত্র হাতে নাচ।

৪। বর্ধা বা বল্লম হাতে নাচ।

৫। হাতে এক জোড়া মন্দিরা অথবা দুই হাতে দু জোড়া মন্দিরার নাচ।

৬। নানা আকারের চামড়ার তালবাদ্যের নাচ।

৭। দুই হাতে কাঁসার বড় করতাল হাতে নাচ।

৮। এক হাতে লম্বা কাঠি বা দুই হাতে দুইটি লম্বা কাঠি নিয়ে নাচ।

৯। বড় লাঠি হাতে নাচ।

১০। রুমাল হাতে নাচ।

১১। ঘটি বা মাটির ঘড়া নিয়ে নাচ।

১২। দুরমুশ হাতে নাচ।

১৩। রণপা চড়ে নাচ।

১৪। চামর হাতে নাচ।

উপরের তালিকায় ঢাল, তলোয়ার, বল্লম, রুমাল, লাঠি, কাঠি, ঘড়া, ঘটি, দুরমুশ, রণপা ইত্যাদির যে তালিকা দিলাম তা শুনে হয়তো অনেকে ভাববেন নৃত্যে এগুলির ব্যবহার হয় কি ভাবে। এর উত্তরে বলব যে, হাতে থাকলেও তার দ্বারা বাস্তব কর্মজীবনের অনুকরণ তারা করে না নাচের সময়। নৃত্যের ভিতর দিয়ে তার ব্যবহারের ইঙ্গিত কখনো করে কিন্তু তা বাস্তবের অনুকরণ নয়।

আজকাল শহরে তৈরী নূতন দলবদ্ধ নাচে গ্রামের কর্মজীবনের অনুকরণে রচিত নানা প্রকার নাচ দেখানো হয়। যেমন কোদাল ও

ঝুড়ি হাতে মাটি কাটার ও মাটি মাথায় করে নিয়ে ফেলার নাচ। বৈঠা হাতে, দড়িদড়া নিয়ে মাছ ধরার নাচ দেখেছি জেলের সাজে। ঘড়া নিয়ে কুয়োর ধারে জল তোলা ও জল ভরার নাচ, তাও দেখেছি। এ ধরনের স্থূল বাস্তব জীবনের অনুকরণ পূর্ব-প্রচলিত গ্রামের দলবদ্ধ নাচে আগে দেখিনি।

ভারতের প্রায় অধিকাংশ দলবদ্ধ প্রাচীন নাচের প্রধান অবলম্বন হল গান। আর তার সঙ্গে থাকে সাধারণতঃ খোল, ঢাক, ঢোল জাতীয় নানা প্রকার চামড়ার তালবাদ্য। মন্দিরা, করতালও থাকে। বাঁশী, শিঙ্গাও এই সঙ্গে বাজে দেখেছি। গ্রামের এই নাচের গান-গুলির কথা নিয়েও কিছু বলার আছে। আমাদের অনেকের ধারণা যে এই সব নাচের গানের মধ্যে দিয়ে গ্রাম সমাজের বাস্তব জীবনের সুখদুঃখের কথাই বলা হয়। কিন্তু সে ধারণা ভুল। দেখা যায়, তারা যে সুখদুঃখের কথা বলে তা তাদের বাস্তবজীবনের সুখদুঃখ নয়। নাচে গান থাকলেও গানের প্রত্যেক শব্দ ধরে অর্থ প্রকাশের কোন চেষ্টাই করে না নাচিয়েরা। গানের মূল ছন্দটাই এ নাচের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। পূর্বেই বলেছি যে, দলবদ্ধ যে কোন নাচ বাইরে থেকে দর্শক হিসেবে দেখ্‌লে ততটা আনন্দ পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় নিজে নাচে যোগ দিয়ে। এই রকমের একটানা সুরের গানের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের নৃত্যভঙ্গি বাইরে থেকে অনেক সময় দেখ্‌তে খুবই একঘেয়ে মনে হয় কিন্তু যারা ঐ নাচে যোগ দেয়, তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেচেও কোন রকম একঘেয়েমীর ক্লান্তি অনুভব করে না। এই সব নাচ একদিক থেকে দেখ্‌তে সহজ, বাজনার ছন্দও সহজ, গানের সুরও সহজ, কিন্তু এই সহজ সুর ও ছন্দের সঙ্গে সহজ নাচের ভঙ্গিতে যে মাধুর্য প্রকাশ পায়, তাতে মন খুবই মুগ্ধ হয়। এর ছন্দের দোলায় এমন একটা মাদকতা থাকে যে, নাচের সময় আর কিছুই খেয়াল থাকে না। সব ভুলে ছন্দের দোলায় মেতে ওঠাই হল দলবদ্ধ লোকনৃত্যের প্রধান গুণ।

দলবদ্ধ "লোকনৃত্য" শুরু হয় ঢিমালয়ে, ক্রমশঃই লয় দ্রুত হতে থাকে এবং নর্তক বা নর্তকীদের সাধ্যমত লয় দ্রুত হবার পর থামে। অনেক নাচে দেখেছি দ্রুত লয়ের সময় গান বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাজতে থাকে কেবল তাল, তালবাদ্যে। গানের সঙ্গে নাচ অধিক প্রচলিত হলেও গান ছাড়া কেবল তালবাদ্য, কাঁসি, শানাই, মন্দিরা, ইত্যাদির ছন্দে ও সুরে নাচতে দেখা যায়।

দলবদ্ধ লোকনৃত্যের আর একটি বিশেষত্ব হল বৃত্তাকারে চলা। তবে কখনো কখনো সামনে এগিয়ে যাবার নাচও দেখেছি। যেমন গ্রামের প্রবেশপথে নাচ শুরু করে থামল এসে গ্রামের আর এক প্রান্তে। বৃত্তাকারে নাচবার কারণ হয়তো হল এই যে, বহুজনের একত্র ছন্দোময় চলার ভঙ্গীতে যে ঐক্য-রসের উৎপত্তি হয় তা প্রকাশ করাই হল এর প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রামের উঠোনে বা মণ্ডপে নাচতে নাচতে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলা ত সম্ভব নয়। তাই ক্রমাগত ঘুরতে হয়, যাতে চলার গতিও ঠিক থাকে অথচ নিজেদের নাচের জায়গা ছেড়ে বাইরে যেতে হয় না।

ইংরেজ যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রসার যত বেড়ে চলেছিল ততই গ্রামের অন্যান্য শিল্পকলার মত নৃত্যকলার চর্চাও গ্রামবাসীদের মধ্যে কমে আসছিল। তাই স্বাধীনতার কিছুদিন আগে থেকেই অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে, এই অবজ্ঞা অবহেলার হাত থেকে ভারতীয় লোকনৃত্যকে কি করে পূর্বের ন্যায় সম্মানের সঙ্গে সমাজের সব স্তরে স্থান করে দেওয়া যায়। কেউ কেউ এ নিয়ে চেষ্টারও ত্রুটি করেন নি। বাংলার ব্রতচারী আন্দোলন ও দক্ষিণভারতে মাদ্রাজ প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগ সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য লোকনৃত্যের চর্চার যে ব্যবস্থা করেছিল তা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার কর্তৃক লোকনৃত্যগীতের ব্যাপক-ভাবে প্রচার ও শহরবাসী শিক্ষিতদের মধ্যে তার সম্মানজনক স্থান

করে দেবার ইচ্ছায় বিশেষ চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার একটি বড় নিদর্শন হল প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লীর লোকনৃত্যগীতের তিন দিন ব্যাপী উৎসব। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ভাল দল বাছাই করে তাদের দিল্লীতে এই উপলক্ষ্যে পাঠায়। সেখানে যে দল শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হয় তাদের রাষ্ট্রপতি পুরস্কৃত করেন। কিন্তু এ চেষ্টাও যথেষ্ট নয় মনে ক'রে অনেকেই ভাবছেন যে আর কি উপায়ে এই মৃতপ্রায় লোকনৃত্যগীতকে বাঁচানো যায়। কেউ কেউ বলেন নানারূপ চলচ্চিত্র ও রেকর্ডিং-এর যন্ত্র সাহায্যে এই সব নৃত্যগীতকে চিরকালের মত ধরে রাখা হোক, তার লাইব্রেরী করা হোক, তা নিয়ে বই লেখা হোক ইত্যাদি। আমি মনে করি কেবলমাত্র এই প্রচেষ্টার দ্বারা ভারতীয় লোকনৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করা কখনো সম্ভব হবে না। এতে করে তাকে কেবল মৃত মমীর মত যাদুঘরে সাজিয়ে রাখবার জিনিস করে তুলতে পারবো। এই নাচকে উচ্চনীচ, শহর-গ্রাম ও শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমাজের সব স্তরে স্থান করে দিতে পারলেই তবে এ বাঁচবে, এবং তা কি ভাবে সম্ভব, সেই প্রস্তাবই আগে পেশ করছি।

প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব উপলক্ষে দিল্লীতে যেভাবে লোকনৃত্যের উৎসব সম্পন্ন হয়, সেই রকম উৎসব প্রাদেশিক সরকারও করবে প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে, সেই প্রদেশের শ্রেষ্ঠ লোকনৃত্যের দল বাছাই করে। প্রত্যেক জেলার প্রধান শহরে এই উৎসব দিনে জেলার ভাল নৃত্যদল, গান ও বাজনার দলকে আহ্বান করতে হবে এবং প্রতিযোগিতার দ্বারা পুরস্কৃত করতে হবে শ্রেষ্ঠকে। গ্রামে যে সব সরকারী প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষার বিদ্যালয় আছে, এই উৎসব দিনে সেই অঞ্চলের লোকনৃত্যগীত হবে তার বিশেষ অঙ্গ এবং তাতে গ্রামের প্রত্যেক শিল্পীদের যোগদানের জন্যে আহ্বান জানাতে হবে। প্রচলিত শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ে সেই প্রদেশের

লোকনৃত্য ও গীতকে সমান স্থান দিয়ে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় বলে গণ্য করতে হবে। এ ছাড়া লোকনৃত্যের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে সেই সব বিদ্যালয়ে আলাদা করে ব্যায়াম শিক্ষাদানের দরকার হবে না। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে, কেবল সেই অঞ্চলের জন্যে, লোকনৃত্য গীতের বিদ্যালয় তৈরি করা দরকার। সেইখানে প্রদেশের বিভিন্ন প্রকার লোকনৃত্যগীতের একজন করে শিক্ষক থাকবেন এই বিদ্যালয়ে প্রদেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের জন্যে লোক নৃত্যগীত শিক্ষক তৈরি হবে। তারা ফিরে গিয়ে বিদ্যালয়ে তা প্রচার করবে।

এই প্রসঙ্গে শহরের রঙ্গমঞ্চে লোকনৃত্যের যে অনুষ্ঠান আজকাল শহরবাসীরা করে থাকেন সে বিষয়ে দু-এক কথা বলবো।

শহরের রঙ্গমঞ্চে গ্রামের নাচ নামে অনেক প্রকার নাচ দেখা যায়। তার মধ্যে গ্রামের একক নাচ ছাড়া দলবদ্ধ নাচই থাকে বেশি। কিন্তু সেই নাচ পল্লীনৃত্য নামে হলেও তা যে পল্লীনৃত্যের আদর্শে গঠিত নয় সে দিক্‌টি কারু নজরে পড়েছে কিনা জানিনা।

আগেই বলেছি যে, দলবদ্ধ লোকনৃত্য অপরকে দেখাবার জন্যে নয়; যারা নাচতে চায় তাদের জন্যে। সুতরাং অপরকে দেখাবার জন্যে শহরের রঙ্গমঞ্চে তাকে দাঁড় করানোর সময় তার রূপ যে বদলাবে তা বলাই বাহুল্য। সেই জন্যে নানারূপ অভিনয় তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয় দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যে।

এই পরিবর্তন কেউ ঠেকাতে পারবেনা। ইয়োরোপের প্রভাবে জর্জরিত নগর-সমাজে গ্রামের দলবদ্ধ নাচ ভিন্নরূপ নেবেই। আর তা নিচ্ছেও। রূপের এই পরিবর্তনের আরো একটি বড় কারণ হলো এই যে, শহরবাসীরা গ্রামের দলবদ্ধ নাচের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক্‌কে সম্পূর্ণ বাদ দিল। যেমন নাচের সঙ্গে গান আর গ্রাম প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের তাল। তার পরিবর্তে স্থান পাচ্ছে এযুগের শহরের Orchestra-সঙ্গীত।

দলবদ্ধ লোকনৃত্যের উৎপত্তি ভারতের গ্রাম-সমাজে যে কারণে ঘটেছিল নগর-সমাজে আমরা যদি তাকে সেই আদর্শে গ্রহণ করতে না পারি, তবে রঙ্গমঞ্চে-সাজানো এই নাচ ক্রমশই শহর-বাসীদের কাছে অনাবশ্যক হয়ে পড়বে। রঙ্গমঞ্চে যে ভাবেই তাকে দাঁড় করাই না কেন, অদূর ভবিষ্যতে শহরের মনকে তেমন আর তৃপ্তি দেবে না। দলবদ্ধ নাচের মূল লক্ষ্যের প্রতি নজর রেখে যদি শহরে আমরা নানা উপলক্ষে এই রকম নাচের চলন করতে পারি তবেই তা হবে প্রকৃত পুনরুজ্জীবন। কিন্তু সেখানেও মনে রাখতে হবে যে, একে যেন কোন সাময়িক প্রয়োজনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করি। এ নাচ যেন হয় নগরবাসী মানুষের মনকে প্রতিদিনের বাস্তবজীবনের একঘেয়েমী থেকে সরিয়ে নিয়ে অনেকে মিলে নির্মল আনন্দ উপভোগ করার উপায়মাত্র।

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ ৭ ২৫ লাইনে—'মুসলমানদের' শব্দটির পরে 'মত' বসিবে।

পৃঃ ২৯ ২০ " —'রইলনা' স্থলে 'রইল' হইবে।

পৃঃ ২৯ ২৩ " —'দিয়েছে' স্থলে 'পেয়েছে' হইবে।

পৃঃ ৩০ ৫ " —'থাকতে' স্থলে 'থাকাতে' হইবে।